শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার জাতীয় পত্রিকা

# গোলাঘর

৫ম বর্ষ ১ম ও ২য় সংখ্যা জানুয়ারি - জুন ২০১৩

**প্রকাশকাল**
১৫.১১.২০১৩

**সম্পাদক**
শরমিন নিশাত
শওকত হোসেন

**যোগাযোগ**
বাবুল অডিও
১৩৭, আজিজ সুপার মার্কেট, নিচতলা শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
মোবাইল ০১৭১৬৪৩৪৪৬৫, ০১৭২০৫৮৭৭২৭, ই-মেইল: golaghor@yahoo.com

**বানান সমন্বয়**
ফরীদুল আলম

**প্রচ্ছদ পরিকল্পনা**
কাইয়ুম চৌধুরী

**পত্রিকার নামলিপি**
শরমিন নিশাত

**প্রচ্ছদ অংকন**
রুবাবা হোসেন নদী

**জনসংযোগ**
আবদুল হাই

**অনলাইন মেকাপ**
খোরশেদ রানা

**মুদ্রণ**
বিকল্প প্রিন্টিং

**মূল্য**
১০০.০০ টাকা
১০০.০০ রুপি
৩ $ ডলার

# স ম্পা দ কী য়

আমরা কি সুন্দরবন ছাড়া কোনো বাংলাদেশের কথা ভাবতে পারি? এমন প্রশ্নের জবাবে দেশের ন্যূনতম বিবেকসম্পন্ন মানুষটিও কী বলবেন সেটি আমরা আন্দাজ করতে পারি। রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা হলে প্রকৃতির এতো সুন্দর দান আমাদের সুন্দরবন ধ্বংস হয়ে যাবে; বিষয়টি একজন শিশুকে বুঝিয়ে বললে সেও বুঝবে, কিন্তু সরকারের এ-সংক্রান্ত নির্বাহীমহল বিষয়টি বুঝতে চাচ্ছেন না। এটি সরকারের অজ্ঞতা হতে পারে না; বরং এটি কতিপয় ব্যক্তির স্বার্থ সংরক্ষণের উপায় ছাড়া কিছু নয়। তা না-হলে, এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র সুন্দরবনের জন্য হুমকি নয় এমন জায়গায় স্থাপনে সরকারের অনীহা কেন?

সকল পরিবেশ বিজ্ঞানী একমত দিয়েছেন যে, কয়লাভিত্তিক এই বিদ্যুৎ-কেন্দ্র রামপালে স্থাপিত হলে সুন্দরবনের পরিবেশ মারাত্মকভাবে দূষণের শিকার হবে। ফলে দীর্ঘমেয়াদে এখানকার গাছপালা, পশু-পাখি, মৎস্য, কীটপতঙ্গ– সবই চরম হুমকির মুখে পড়বে। শুধু কয়লা পোড়ানোর ফলেই সুন্দরবনের বাতাস, মাটি ও পানি দূষিত হয়ে পড়বে, কারণ রামপাল সুন্দরবনের একেবারেই কাছের একটি এলাকা। এমনকি পশুর নদ দিয়ে কয়লাবাহী যে-সব জাহাজ আসবে সেই জাহাজের শব্দ, ঢেউ, ফ্লাডলাইট এবং জাহাজ চলাচলের লক্ষ্যে ড্রেজিং ইত্যাদি বিষয়গুলোও ওই অঞ্চলের প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে ব্যহত করবে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, কয়লা পোড়ালে প্রথমত বায়বীয়, দ্বিতীয়ত কঠিন এবং তৃতীয়ত তরল– এই তিন ধরণের দূষণই নির্গত হয়; কার্বন ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড এবং সালফার ডাই অক্সাইড– এই তিন ধরণের বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হয়; সৃষ্ট ছাইয়ের ভেতরে পারদ, সিসা ও আর্সেনিক জাতীয় ভারী ধাতব পদার্থ থেকে যায়– যা মাটিতে মিশে ওই এলাকার মাটিকে দূষিত করে তুলবে; যে-পরিমাণ দূষিত তরল নির্গত হবে তা পড়বে গিয়ে পশুর নদে এবং এই নদ হয়ে তা খুব সহজেই ঢুকে পড়বে সুন্দরবনে।

কয়লা পোড়ানোর পর নির্গত দূষিত বাতাস ও দূষিত ছাইকে আটকে দেয়ার প্রক্রিয়ার কথা বলা হলেও এই প্রক্রিয়ায়ও যে-পানি ও রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয় সেই সব থেকে আরেক ধরনের বিষাক্ত বর্জ্য-পানি বের হয়ে একই ধরনের দূষণের সৃষ্টি করবে।

রামপাল প্রকল্প বাস্তাবায়নের পক্ষে ছাড়পত্র দাতা প্রতিষ্ঠান হল সরকার নিয়ন্ত্রনাধীন 'সিইজিআইএস'। এদের জরিপ-গবেষণা অতপর এ ধরনের সংবেদনশীল স্থানে কয়লা বিদ্যুৎ-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ছাড়পত্র দেয়ার মধ্যে সরকারের ইচ্ছারই প্রতিফলন ঘটেছে।

সুতরাং হাতেগোনা কিছু লোকের ব্যক্তিস্বার্থ ও খামখেয়ালির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এ-ধরনের প্রকল্প রামপাল থেকে সরিয়ে অন্যত্র স্থাপনের জন্য সরকারকে বাধ্য করা দেশের প্রতিটি নাগরিকের আজ নৈতিক কর্তব্য ।

সংখ্যাটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই কৃতজ্ঞতা ।

**শওকত হোসেন**
**শরমিন নিশাত**
**১৫.১১.২০১৩**

---

## সূচি


স্মরণ
ছবি: অতুলপ্রসাদ সেন ০৫

ব্যক্তিত্ব / প্রবন্ধ
অতুলপ্রসাদ সেন: জীবন ও কর্ম
বিশ্বজিৎ ঘোষ ০৬

দর্শন / প্রবন্ধ
সবই কি পূর্বনির্ধারিত?
সিদ্ধার্থ শংকর জোয়ার্দার ১৬

শিক্ষা / প্রবন্ধ
শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য
বদরুদ্দীন উমর ২৫

কবিতা
আশি, নব্বই, প্রথম ও দ্বিতীয় দশকের কবিতা ৩৬

প্র ব ন্ধ
অরিয়েন্টালিজম
ফ য়ে জ আ ল ম ১০৯

গ ল্প
যেদিন রুগ্নতাকে মেনেছি প্রভু
শ ও ক ত হো সে ন ১১৮

প্রকাশিত গল্পের মন্তব্য
জা কি র তা লু ক দা র ১২৫

অ নু বা দ / প্র ব ন্ধ
ধার্মিক বুর্জোয়া এবং অধার্মিক সর্বহারা
প ল লা ফা র্গ / অ রি ন ভা দু ড়ী ১২৬

ব ই / আ লো চ না
কঠোর ব্যক্তিত্বে উত্তীর্ণ কবিতায়
শ ও ক ত হো সে ন ১২৯

(স্ম র ণ)

# অতুলপ্রসাদ সেন

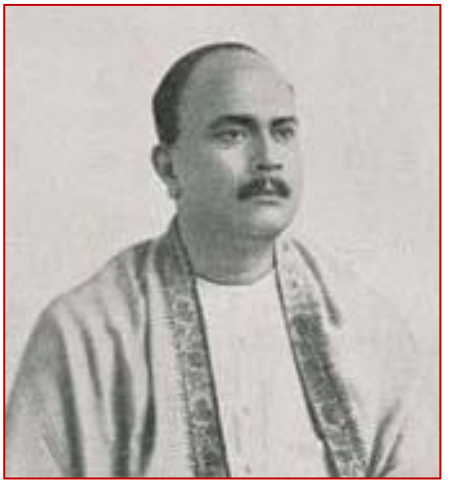

১৮৭১ -১৯৩৮

# অতুলপ্রসাদ সেন: জীবন ও কর্ম

.....

বি শ্ব জি ৎ ঘো ষ

অতুলপ্রসাদের কৈশোর আর সদ্য-আবির্ভূত যৌবনের দিনগুলো ছিল রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং উন্মাদনা আর সংক্ষোভে উত্তাল। রাজনৈতিক এই উত্তেজনায় কিশোর অতুলপ্রসাদ সহজেই আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপ্লবী মনমোহন ঘোষ, আনন্দমোহন বসু, টি. পালিত– প্রমুখের বক্তৃতা শুনে তিনি কিশোর বয়সেই রাজনীতির প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এইসব বিপ্লবী নেতা ঢাকায় এলেই তিনি তাঁদের বক্তৃতা শুনতে যেতেন। বক্তৃতা শুনে এসে তিনি তা বাসায় একাকী নকল করে উচ্চারণ করতেন এবং বন্ধুদের সঙ্গে এ-সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। উত্তরজীবনে কংগ্রেসের রাজনীতির প্রতি তাঁর যে গভীর অনুরাগ সৃষ্টি হয়, তার বীজ ঢাকাজীবনেই এভাবে উপ্ত হয়েছিল।

বিপ্লবী সুরেন্দ্রনাথের প্রতি অতুলপ্রসাদের আকর্ষণ ছিল সুতীব্র। বস্তুত, সুরেন্দ্রনাথই অতুলপ্রসাদের চিত্ততলে জাগিয়ে দিয়েছিলেন দেশসেবার বাসনা। সুরেন্দ্রনাথকে তিনি অত্যন্ত বিশ্বাস ও ভক্তি করতেন। কংগ্রেস থেকে সুরেন্দ্রনাথ দূরে সরে গেলে অতুলপ্রসাদ খুব ক্ষুব্ধ হন, ব্যথিতচিত্তে উচ্চারণ করেন– "The National Congress without Surendra Nath Banerjee is a mere farce." কেবল সুরেন্দ্রনাথই নন, চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রী অরবিন্দ প্রমুখ বিপ্লবীও কৈশোরজীবনে অতুলপ্রসাদের চিত্ততলে দেশপ্রেম ও বিপ্লবীচেতনা বিকাশের আলোকপ্রদীপ জ্বেলে দিয়েছিলেন।

অতুলপ্রসাদের কর্মজীবনের সূচনা ঘটে ১৮৯৫ সালে– কলকাতা হাইকোর্টে আইনজীবী হিসেবে যোগদানের মধ্য দিয়ে।

আইন ব্যবসায়ে আকাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জনের পর অতুলপ্রসাদ সমাজকল্যাণমূলক কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। প্রথমেই তিনি লক্ষ্ণৌ শহরের অবকাঠামো উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করলেন। লক্ষ্ণৌ মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের তৎকালীন ভাইস-চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ ভার্মার সহযোগী হিসেবে অতুলপ্রসাদ লক্ষ্ণৌ শহরের সৌন্দর্যবর্ধনে কতিপয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর কর্মে সমগ্র লক্ষ্ণৌবাসী খুব খুশি।

এভাবে, আপন কর্মস্পৃহা দিয়ে, লক্ষ্ণৌ মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের ভবিষ্যৎ ভাইস-চেয়ারম্যান হওয়ার পথ নির্মাণ করে নেন অতুলপ্রসাদ ।

লক্ষ্ণৌ-প্রবাসী বাঙালি সুধীজন ১৮৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত করেন 'বিদ্যাসাগর গ্রন্থাগার' । এই গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে ১৮৯৪ সালে গঠিত হয় 'বঙ্গীয় যুবক সমিতি' । ১৯০২ সালে অতুলপ্রসাদ বঙ্গীয় যুবক সমিতির সভাপতি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন । আমৃত্যু তিনি এ-পদে অধিষ্ঠিত থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কর্ম সমাধা করেছেন । সমিতির সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর অতুলপ্রসাদের কর্মের ব্যাপ্তি অনেক বেড়ে যায় । তাঁর আন্তরিক উদ্যোগের ফলে সমিতির সকল বিভাগেই দৃষ্টিগ্রাহ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয় । ফলে দিন দিন তাঁর জনপ্রিয়তার মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে– তিনি হয়ে ওঠেন লক্ষ্ণৌ-এর মুকুটহীন সম্রাট এ. পি. সেন ।

১৯০৩ সালে লক্ষ্ণৌ-এ স্থাপিত হয় 'গুডউইল ক্লাব' । দুঃস্থ, নিঃস্ব, অসহায় লোকদের সাহায্য ও সেবা-শুশ্রূষা করাই ছিল এ-ক্লাবের প্রধান কাজ । ক্লাবের সভ্যদের পক্ষ থেকে অতুলপ্রসাদের কাছে অনুরোধ এল– তাঁকেই হতে হবে ক্লাবের সভাপতি । সমাজউন্নয়নের বাসনা ছিল বলে তিনি সানন্দচিত্তে সভ্যদের অনুরোধ রক্ষা করেন । এ-ক্লাবের সভাপতিরূপে তিনি বেশকিছু সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেন । গুডউইল ক্লাবের উদ্যোগে শহরে প্রতিষ্ঠিত হয় অনেকগুলো 'সেবাশ্রম সমিতি' । প্রতিটি সেবাশ্রম সমিতিরই প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন অতুলপ্রসাদ সেন ।

বঙ্গভঙ্গের পরের বছর, ১৯০৬ সালে, লক্ষ্ণৌ-এ প্রতিষ্ঠিত হয় 'আউধ সেবা সমিতি' । বালকদের সংঘবদ্ধ করে মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহের মাধ্যমে দুঃস্থ মানুষকে সেবা করাই ছিল এ সমিতির লক্ষ্য । এ-সমিতির সঙ্গে লক্ষ্ণৌ-এর বাঙালি-অবাঙালি অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিই জড়িত ছিলেন, কিন্তু সকলের অনুরোধে অতুলপ্রসাদ সেন সভাপতি হিসেবে এ-সমিতিরও দায়িত্বভার গ্রহণ করেন । এ-সমিতির অধীনে গড়ে-ওঠে একদল তরুণ স্বেচ্ছাসেবক, যারা বন্যা-দুর্ভিক্ষ-দুর্বিপাকের সময় বিপদাপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়াবে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে– এই ছিল যাদের মূলমন্ত্র ।

নারী-শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে ১৮৯৫ সালে প্রবাসী বাঙালিরা স্থাপন করেন 'হিন্দু গার্লস স্কুল' । এখানেও লাগল অতুলপ্রসাদের কর্মী-হাতের স্পর্শ । ১৯০২ সালে তিনি লক্ষ্ণৌ-এর হিন্দু গার্লস স্কুলের সভাপতি নির্বাচিত হন ।

এভাবে একাধিক জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মূল পরিচালক হিসেবে অতুলপ্রসাদ সেন যেসব কাজ করেছেন, তাতে অচিরেই লক্ষ্ণৌবাসীর কাছে 'সেন সাহেব' পরিচয়ে তিনি সুপরিচিত হয়ে ওঠেন । নিকটজনেরা তাঁকে ডাকেন 'ভাই দাদা' বলে । লক্ষ্ণৌ শহরের কোনো কাজই যেন হতে চায় না অতুলপ্রসাদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছাড়া । সর্বত্রই তাঁর উপস্থিতি অনিবার্য, তাঁর উপদেশ ছাড়া কোনো কাজই যেন চলতে চায় না, সব কর্মেই চাই তাঁর সাহায্য-সহযোগিতা । ১৯০২ সালের এক অখ্যাত

ব্যারিস্টার, এভাবে, মাত্র তিন বছরের সাধনায়, ১৯০৫ সালের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত স্বনামধন্য ব্যারিস্টারই হলেন না– তিনি হয়ে উঠলেন সংযুক্ত প্রদেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা, লক্ষ্ণৌ-এর মুকুটহীন সম্রাট, অনুরাগীর বন্ধু, দুঃখী মানুষের ত্রাণকর্তা।

১৯০৫ সালে বেনারসে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন। এ উপলক্ষে লক্ষ্ণৌ-এর শীর্ষস্থানীয় রাজনীতিবিদরা অতুলপ্রসাদের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন গঙ্গাপ্রসাদ ভার্মা, গোকরণনাথ মিশ্র, বিশ্বেশ্বরনাথ শ্রীবাস্তব, মমতাজ হোসেন এবং আরও অনেকে। লক্ষ্ণৌ থেকে যে ক'জন কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য নির্বাচিত হলেন, অতুলপ্রসাদ তাঁদের অন্যতম। অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যবৃন্দের অনুরোধে তিনি এ-সমিতির পরিচালকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এভাবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের রাজনীতির সঙ্গে অতুলপ্রসাদ আস্তে আস্তে জড়িয়ে পড়েন।

১৯০৫ সাল। বাংলার এক ভয়াবহ দুরবস্থার কাল। বঙ্গভূমি দ্বিখণ্ডিত হল– বাংলার জনচিত্ত আঘাতে ও বেদনায় দীর্ণ ও আর্দ্র। বাংলার এই দুর্দিনে লক্ষ্ণৌ-প্রবাসী অতুলপ্রসাদ বিচলিত হয়ে ওঠেন, তিনি ব্যথিত হন। দেশবিভাগকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী গণআন্দোলনে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তিনি ছুটে যান মানুষকে সচেতন করার মানসে। এমনি এক দিনে অভাবিত এক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন অতুলপ্রসাদ। তাঁর নিজের ভাষায়– "তখন স্বদেশী আন্দোলন খুব চলিতেছে, আমি কলিকাতায় যাইব বলিয়া রওনা হইয়া হাওড়া স্টেশনে নামিয়া দেখি অনেক ছেলে মিলিয়া আমার একখানি স্বদেশী গান সমবেত কণ্ঠে গাহিতে গাহিতে চলিতেছে। আমি অল্পক্ষণ দাঁড়াইয়া শুনিলাম এবং ভাবিলাম আমার গান এত সমাদৃত হইয়াছে! তখন কাছে একটি ছেলেকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম : 'এ গানটি কার ভাই, তোমরা যা গাইছ!' ছেলেটি আশ্চর্য হইয়া বলিল, 'কেন, এ তো অতুলপ্রসাদ সেনের গান, আপনি জানেন না!' আমি আর কী বলিব, একটু হেসে নিজ গন্তব্যস্থানে চলিয়া গেলাম।"

অতুলপ্রসাদের চিত্তলোকে অধ্যাত্মবিশ্বাসের বীজ রোপিত হয় শৈশব-কৈশোর জীবনেই। পরিণত বয়সে সে-বিশ্বাস আরো দৃঢ়মূল হয়েছে, প্রতীতিতে হয়েছে প্রবল। এই অধ্যাত্মবিশ্বাসের আন্তরপ্রেরণায় তিনি লক্ষ্ণৌ-এর অন্যতম ধর্মীয় সংগঠন 'উপাসনা সভা'য় যোগ দেন। ১৯১১-১২ সালের দিকে অতুলপ্রসাদ ও হেমকুসুমের দাম্পত্যজীবনে নেমে আসে প্রবল অশান্তি। দাম্পত্যজীবনের এই অশান্তিকে ভুলে থাকার জন্য 'উপাসনা সভা'র কর্মকাণ্ডে অতুলপ্রসাদ নিজেকে নিয়োজিত করলেন যেন। সবাই বিস্ময়ে অভিভূত–সমাজকল্যাণমূলক কাজের মতো ধর্মীয় কর্মকাণ্ডেও সেন সাহেবের কোনো জুড়ি নেই। লক্ষ্ণৌ-এর উপাসনা সভায় সে-সময় যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অঘোরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভুচরণ চৌধুরী, শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলচন্দ্র দে, চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ বল, বিদ্যাপতি ভট্টাচার্য, সুধীরকুমার সেন, রাজনারায়ণ শুক্লা, মহেশচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এতসব যোগ্য ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও অতুলপ্রসাদই হয়ে উঠলেন 'উপাসনা সভা'র মূল পরিচালক।

লক্ষ্ণৌ শহরের নিরক্ষর মানুষদের অক্ষরজ্ঞান দেওয়ার মানসে অতুলপ্রসাদ ১৯১৩ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'গোখলে স্টুডেন্ট সোসাইটি'। গরিব দুস্থ ছাত্রদের পড়ালেখায় সাহায্যপ্রদানও ছিল এ-সংস্থার অন্যতম কাজ। অতুলপ্রসাদের উদ্যোগে এবং প্রফেসর উপেন্দ্রনাথ বলের আন্তরিক প্রয়াসে ক্যানিং কলেজের বোর্ডারদের নিয়ে গড়ে ওঠে এই সংস্থা। অতুলপ্রসাদ হলেন এ-সংস্থার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এই সংস্থার সদস্যদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যরা হচ্ছেন রাজনারায়ণ শুক্লা, শ্রীনারায়ণ মিশ্র, সুরেন্দ্রবিক্রম সিং, কৃপাশঙ্কর নিগম, এস. এন. রায়, হরগোবিন্দ দয়াল, শ্রীবাস্তব, বসন্তকুমার ঘোষাল প্রমুখ। অতুলপ্রসাদের প্রেরণায় সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছাত্ররা জনসেবার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেন। তারা বোর্ডিংয়ের চাকর, মালি সকলকে একত্র করে পড়ালেখা শেখাতেন, শহরের নিম্নস্তরের নিরক্ষর মানুষদের অক্ষরজ্ঞান প্রদানে সহায়তা করতেন। ১৯১৫ সালে লক্ষ্ণৌ-এ ভয়াবহ বন্যা দেখা দিলে এই সংস্থার সভ্যরা দিন-রাত সেবা-শুশ্রূষা প্রদান করে লক্ষ্ণৌবাসীর মন জয় করে নিয়েছিলেন এবং স্থাপন করেছিলেন মানবতার এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এখানে বলা প্রয়োজন, এসব সংস্থা-সংগঠন পরিচালনার জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন হত। মানবতার ডাকে সাড়া দিয়ে অতুলপ্রসাদ একাই প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থায় প্রদান করতেন।

১৯১১ সাল। লক্ষ্ণৌ মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচন। অতুলপ্রসাদ সেন নির্বাচনে প্রার্থী হলেন, এবং বিপুল ভোটে বিজয়ী হলেন। এবার তিনি লক্ষ্ণৌ শহরের অবকাঠামো-উন্নয়নে গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করলেন। শহরের সৌন্দর্যবর্ধনের দিকেও তিনি দৃষ্টি দিলেন। লক্ষ্ণৌ শহর সেন সাহেবের হাতের স্পর্শে যথার্থ অর্থেই একটি 'উদ্যান নগরী' বা 'সিটি অব পার্কস'-এ রূপান্তরিত হল। নতুন নতুন পার্ক হল, নির্মিত হল সুন্দর প্রশস্ত রাস্তা-ঘাট। সেন সাহেবের জয়-জয়কারে সারা শহর মুখর।

কংগ্রেসের রাজনীতির সঙ্গে অতুলপ্রসাদ ছিলেন গভীরভাবে সংযুক্ত। রাজনীতিতে তিনি নরমপন্থী হলেও মতবাদে ছিলেন উদার। তিনি যা বুঝতেন, স্পষ্টভাষায় তা ব্যক্ত করতেন, আর সর্বদা অনুসরণ করতেন নিরপেক্ষ নীতি। এই স্বাধীনচিত্ততার জন্য রাজনীতি-অঙ্গনের সকলেই তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। ফলে একদিকে সুরেন্দ্রনাথ, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, তেজবাহাদুর সপ্রু, সি. ওয়াই. চিন্তামণি প্রমুখ যেমন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, তেমনি লালা লাজপৎ রায়, মহম্মদ আলী, সৌকৎ আলী, মদনমোহন মালব্য, সরোজিনী নাইডু, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখের সঙ্গেও ছিল তাঁর সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক। মহাত্মা গান্ধীকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। লোকমান্য তিলক বন্দি হলে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন, হন মর্মাহত। তাঁর সে-মর্মবেদনা অভিব্যক্তি লাভ করে নিম্নোক্ত সঙ্গীতে–

কঠিন শাসনে করো মা, শাসিত ।
আমরা দয়ার তব নহি অধিকারী ।

ছিলে মা, অতুল-বিভব-শালিনী ।
মোদের লাগিয়ে হলে কাঙালিনী;
দীনবেশ তব হেরিয়া জননী,
নয়নে নাহি অনুতাপ-বারি ।

স্বার্থ-মোহে মোরা সদাই হতজ্ঞান,
আপন-দোষে মোরা হারাই নিজ মান ।
ভায়েরে ঘৃণা করি, করিয়া অপমান,
পরের কাছে মোরা কৃপা-ভিখারি ।

আপন ধন পদ যশের আশায়
মিথ্যা প্রীতি-পূজা জানাই তোমায়;
প্রাণের অঞ্জলি দিতে নারি পায়
যে পদ ধৌত করে জাহ্নবী-বারি ।

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে আন্তরিক নিষ্ঠার কারণে তিনি সকলের কাছে খুব প্রিয়ভাজন মানুষ হয়ে ওঠেন। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাঁকে খুব পছন্দ করতেন। এ-কারণে, কোনো নেতা লক্ষ্ণৌ এলেই অতুলপ্রসাদের বাসায় এসে উঠতেন, লক্ষ্ণৌ-এর দিনগুলো তাঁরা অতুলপ্রসাদের অতিথি হয়েই কাটাতেন। এভাবেই তাঁর বাসায় একে একে অতিথি হয়েছেন শিবনাথ শাস্ত্রী, বিপিনচন্দ্র পাল, মহাত্মা গান্ধী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজিনী নাইডু, লর্ড সিংহ প্রমুখ দেশবরেণ্য নেতা।

১৯১৬ সালের ডিসেম্বর মাস। লক্ষ্ণৌ শহরে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে কংগ্রেসের অধিবেশন। কিন্তু অতুলপ্রসাদ তখন কলকাতায়। লক্ষ্ণৌ শহরে কংগ্রেসের অধিবেশন, আর লক্ষ্ণৌ-এর মুকুটহীন সম্রাট অতুলপ্রসাদ অধিবেশনে অনুপস্থিত। এ হতেই পারে না। নভেম্বর মাসেই কলকাতায় গিয়ে পৌঁছলেন অতুলপ্রসাদের বিশেষ বন্ধুরা– মির্জা সামীউল্লা বেগ, গোকরণনাথ মিশ্র এবং বিশ্বেশ্বরনাথ শ্রীবাস্তব। বন্ধুদের অনুরোধে অধিবেশনের পূর্বেই তিনি লক্ষ্ণৌ পৌঁছলেন। অধিবেশন উপলক্ষে গঠিত হল অভ্যর্থনা সমিতি। অভ্যর্থনা সমিতির অন্যতম সম্পাদক হিসেবে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হলেন অতুলপ্রসাদ সেন। এ-ছাড়া অধিবেশন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ভলান্টিয়ারদের ক্যাপ্টেন হিসেবেও নির্বাচিত হলেন তিনি। ক্যাপ্টেন নির্বাচিত হতে পেরে তিনি খুব খুশি। তরুণদের মাঝে থেকে কাজ করতে তিনি খুব পছন্দ করতেন। এখন তাঁর

অধীনে চারশো তরুণ ভলান্টিয়ার কাজ করবে। তাঁর খুশির আর সীমা নেই। তাঁর ডায়েরির পাতায় এ-সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়। ডায়েরির প্রথম পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন–

Congress 1916. Lucknow. December.
Captain–A. P. Sen.
Vice-Captain–Dr. Naziruddin and Pdt. Harkaran Nath Misra.
Lieutenant–40. Volunteers–360
Distribution of Volunteers–Railway station.
(i) All Volunteers will meet on..... to get instruction,
(ii) Discipline–(a) Volunteers must implicitly obey their Lieutenants,
Vice Captains and Captain; (b) All Volunteers must salute all Lieutenants,Vice-Captains and Captain; (c) Duties may be transfered
by Vice-Captains and Captain.

কংগ্রেস উপলক্ষে অতুলপ্রসাদের ব্যস্ততার কোনো শেষ নেই। বিশ্রামের কথা তিনি ভুলে গেলেন। সর্বদা তিনি অধিবেশন কম্পাউন্ডে অবস্থান করছেন, সমস্ত পরিকল্পনার তত্ত্বাবধায়ন করছেন। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন অমল হোম। কংগ্রেস অধিবেশনে অতুলপ্রসাদের কর্মব্যস্ততার পরিচয় তাঁর স্মৃতিতে ধরা আছে এভাবে–

কংগ্রেস বসার তিন দিন আগে লক্ষ্ণৌ গেলুম। অতুল কংগ্রেস কম্পাউন্ডে তাঁবুতেবাস করছেন। যোধপুরি পায়জামার ওপর খাকি রঙের ইউনিফর্ম কোট, মাথায়রাজপুত পাগড়ি। বুকে কর্ড দিয়ে বাঁধা হুইসিল, হাতে ছড়ি। ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন। ...

সেবার লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে গিয়ে বুঝলুম অতুল লক্ষ্ণৌবাসীর কত প্রিয়। সত্যি, তিনি লক্ষ্ণৌর মুকুটহীন রাজা ছিলেন। ধনী, দরিদ্র, একস্ট্রিমিস্ট, মডারেট, রাজা, নবাব, উকিল, অধ্যাপক, হিন্দু-মুসলমান সকল শ্রেণী, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর অদ্ভুত প্রভাব। দেখলুম সামান্য টাঙ্গাওয়ালা অব্দি 'সেন সাহেব'-কে জানে। কংগ্রেসের ভলান্টিয়াররা তাঁর অঙ্গুলি হেলনে নিঃশব্দে আদেশ পালন করছে।... লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস থেকে অতুলের চরিত্রের আর একটা দিক– তাঁর কর্মশক্তি, স্বদেশপ্রেম, লোকহিতৈষণা, বন্ধুবাৎসল্য দেখে মুগ্ধ হলুম।

লক্ষ্ণৌ অধিবেশন নানা কারণেই খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কংগ্রেসের মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্য দেখা দেয় এই অধিবেশনের সময়। নরমপন্থী আর চরমপন্থীদের দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পায়, বৃদ্ধি পায় উত্তেজনা আর মতান্তর। অম্বিকাচরণ মজুমদার, মহাত্মা গান্ধী, লোকমান্য তিলক, সরোজিনী নাইডু, পোলর্ক প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় কংগ্রেস-নেতৃত্বও উভয় পক্ষের দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধ নিরসনে ব্যর্থ হলেন। এই দ্বন্দ্বের ফলে দেখা গেল কংগ্রেস-

নেতৃত্ব নরম বা চরমপন্থীদের কাছ থেকে জাতীয়তাবাদীদের হাতে চলে গেল। কংগ্রেসের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব ও উত্তেজনা অতুলপ্রসাদকে হতাশ করল, রাজনীতির প্রতি তিনি হয়ে উঠলেন বীতশ্রদ্ধ। পরের বছর, ১৯১৭ সালে, কংগ্রেসের সদস্যপদ থেকে তিনি ইস্তফা দেন। পরবর্তীকালে লিবার‍্যাল ফেডারেশনে যোগদান করলেও তিনি সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে আর কখনো সংযুক্ত হননি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় দেশের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নানা ধরনের সংস্থার জন্ম হয়। এমনি একটি সংস্থার নাম 'আওয়ার ডে'। সংস্থার অন্যতম কাজ ছিল বাঙালি কিশোর-কিশোরীদের দিয়ে গানের আসর ও নাটক মঞ্চস্থ করে অর্থ সংগ্রহ করা। লক্ষ্ণৌ-এর অদূরে সীতাপুরে অনুষ্ঠান করার আমন্ত্রণ পেল 'আওয়ার ডে'। সকলে গিয়ে উপস্থিত হল অতুলপ্রসাদের বাড়িতে। সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে, বঙ্গীয় যুবক সমিতির কনসার্ট পার্টির ঐকতান-বাদন এবং কিশোর-কিশোরীদের দ্বারা অতুলপ্রসাদের গান গাওয়ানো হবে 'আওয়ার ডে'-র অনুষ্ঠানে। গান-নির্বাচন এবং তা শেখানোর দায়িত্ব নিলেন অতুলপ্রসাদ স্বয়ং। এ-উপলক্ষে তিনি রচনা করলেন উদ্দীপনামূলক সুবিখ্যাত এই সঙ্গীত–

হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর,
হও উন্নতশির–নাহি ভয়।
ভুলি' ভেদাভেদ-জ্ঞান হও সবে আগুয়ান
সাথে আছে ভগবান–হবে জয়।

নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান,
বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান ;
দেখিয়া ভারতে মহাজাতির উত্থান
জনজন মানিবে বিস্ময়,
জনজন মানিবে বিস্ময়!...

ন্যায় বিরাজিত যাদের করে
বিঘ্ন পরাজিত তাদের শরে;
সাম্য কভু নাহি স্বার্থে ডরে–
সত্যের নাহি পরাজয়,
সত্যের নাহি পরাজয়!

কংগ্রেস অধিবেশন-উপলক্ষে লক্ষ্ণৌ এসে অতুলপ্রসাদ অতীতের কর্মস্থলের টানে আবার আটকে পড়লেন। বন্ধুদের অনুরোধে তিনি লক্ষ্ণৌ কোর্টে আইনব্যবসা আরম্ভ করেন। এ-সময় তিনি ব্যারিস্টার হেমন্তকুমার ঘোষকে তাঁর জুনিয়র করে নেন। হেমন্তকুমার দীর্ঘ সতেরো বছর (১৯১৭-১৯৩৪) অতুলপ্রসাদের সহকারী হিসেবে কাজ

করেছেন। উল্লেখযোগ্য যে, অতুলপ্রসাদ তাঁর কর্মজীবনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একাধিক আইনজীবীকে তাঁর জুনিয়র হবার সুযোগ দিয়েছেন। অতুলপ্রসাদের জুনিয়র হয়ে কাজ করা ছিল তরুণ আইনজীবীদের কাছে এক মহার্ঘ্য অভিজ্ঞতা।

লক্ষ্ণৌ অধিবেশনের পর কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ বিরোধ ক্রমশ দানা-বেঁধে ওঠে এবং ১৯১৮ সালের বোম্বে অধিবেশনের সময় তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯১৮ সালে সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে গঠিত হল ভারতীয় জাতীয় লিবার‍্যাল ফেডারেশন। অতুলপ্রসাদ লিবার‍্যাল ফেডারেশনের সভ্য হলেন। ১৯১৯ সালে সুরেন্দ্রনাথ লক্ষ্ণৌ এলে অতুলপ্রসাদ তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। তিনি ছিলেন সর্বপ্রকার পার্টি-পলিটিক্সের ঊর্ধ্বে। লিবার‍্যাল ফেডারেশনের সভ্য হলেও তিনি ছিলেন স্বভাব-নিরপেক্ষ। তাই, যখনি যেখানে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছে, তিনি সেখানে যোগ দিয়েছেন স্বেচ্ছায়।

লক্ষ্ণৌ শহরে হিন্দি ভাষাচর্চার মানসে তিনি স্থাপন করেন 'হিন্দি সভা' নামক সংগঠন। 'হিন্দি সভা' স্থাপিত হয় ১৯২০ সালে। 'হিন্দি সভা'র প্রথম সভাপতি অতুলপ্রসাদ সেন, আর সাধারণ সম্পাদক গোপালচন্দ্র সিন্‌হা। তাঁর উদ্যোগেই স্থাপিত হয় 'হিন্দি সভা'র নিজস্ব পাঠাগার। প্রতি সপ্তাহেই 'হিন্দি সভা'র বৈঠক বসত। বৈঠকে হিন্দি সাহিত্য পাঠ ও আলোচনা, সঙ্গীতচর্চা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হত। অতুলপ্রসাদ প্রতি বৈঠকেই তাঁর নিজস্ব গান গেয়ে শোনাতেন।

১৯২০ সালে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রাথমিক আয়োজন শুরু হল। গোমতীর তীরে নবাব নাসিরুদ্দীনের বিলাসকুঞ্জকে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপদানের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। কিন্তু এ-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রচুর টাকা চাই, কোথায় পাওয়া যাবে এত টাকা। সেন সাহেবের কাছে সংবাদটা পৌঁছল, অমনি অগ্র-পশ্চাৎ কোনো কিছু না-ভেবেই তিনি এককালীন দশ হাজার টাকা বিশ্ববিদ্যালয় তহবিলে জমা দেন। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। গঠিত হল লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কার্যকরী-পরিষদ। কার্যকরী-পরিষদের অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হলেন অতুলপ্রসাদ। এছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরামর্শদাতা কমিটির প্রধান হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন।

শিক্ষার প্রতি অতুলপ্রসাদের অনুরাগ ছিল অসীম। শিক্ষা-কাঠামোর নানা সমস্যা সমাধানে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। এরই স্বীকৃতি স্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক স্কুল পর্যন্ত– সর্বত্রই ছিল তাঁর গর্বিত বিচরণ। ১৯২৫ সালে তিনি লক্ষ্ণৌ-এর বাঙালি বালিকা বিদ্যালয় 'হরিমতী গার্লস স্কুলের' সভাপতি নির্বাচিত হন। পরে এই স্কুলের নাম রাখা হয় 'জুবিলি গার্লস স্কুল'। অতুলপ্রসাদ আমৃত্যু এই স্কুলের সভাপতির পদে আসীন ছিলেন। তিনি এই স্কুলের প্রয়োজনে হাজার হাজার টাকা দিয়েছেন।

১৯২১ সালের ৬ আগস্ট লক্ষ্ণৌ-এ উত্তর প্রদেশ লিবার‍্যাল পার্টির অধিবেশন বসে। অধিবেশন উপলক্ষে গঠিত অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন অতুলপ্রসাদ। অধিবেশনে তিনি স্বদেশী আন্দোলনের সপক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এ সম্পর্কে Indian Annual Register-এ (1921) উল্লেখ করা হয়–

Mr. A. P. Sen moved a resolution supporting the Swadeshi movement

and in his speech, while exherting them to take to Swadeshi he con- demned and spectacular demonstration of industrial patriotism in the boycott and burning of foreign clothes at a time when the country had not even half the out-put of clothes to meet its demand.

১৯২৩ সালের ২৩ থেকে ২৫ আগস্ট বেনারস শহরে বসে উত্তর প্রদেশ লিবার‍্যাল পার্টির অধিবেশন। সে-অধিবেশনে মূল সভাপতি নির্বাচিত হন অতুলপ্রসাদ। অধিবেশনে তিনি যে সুচিন্তিত ভাষণ দেন, Indian Annual Register-এ (1921) তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত আছে এভাবে–

The president dwelt mainly on all Indian topics, especially on theposition of India in the Empire, the Kenya outrage, then the burning topic of the day, and advocated strong measures such as retaliation and boycott of the Imperial conference and the Empire Exhibition in

return. He further insisted upon freeing the Government of India from the Secretary of states control, a radical reform of the Military

policy and a substantial reduction of the Military expenditure and

exposed the farce that was being enacted by the Government of Indianising the eight units of the Indian army....He also dwelt upon the subjects of the separation of functions (Judicial and Executive), Hindu-Muslim relations, the Swadeshi movement, the realtions between landlords and tenants, between Capital and Labour and some other provincial or less important topics.

১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লক্ষ্ণৌ-এ সংঘটিত হয় ভয়াবহ দাঙ্গা। দাঙ্গার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অতুলপ্রসাদ হিন্দু-মুসলমান বন্ধুদের নিয়ে দাঙ্গা-বিধ্বস্ত এলাকায় ছুটে যান, মানুষকে বুঝাতে চেষ্টা করেন কী সামান্য কারণে তারা কত বড় মরণনেশায় মেতে উঠেছে। অবিলম্বে দাঙ্গা বন্ধ করার জন্য তিনি হিন্দু-মুসলমান– দুই সম্প্রদায়ের কাছেই সনির্বন্ধ আহ্বান জানান। তাঁর আহ্বানে কাজ হয়, থেমে যায় দাঙ্গা। এ কারণে লক্ষ্ণৌ শহরে তাঁর জনপ্রিয়তা আরো বৃদ্ধি পায়। তাঁর প্রতি লক্ষ্ণৌবাসীর ভালোবাসা এতই প্রবল ছিল যে, তাঁর বাড়ির নিকটবর্তী রাস্তার নাম রাখা হল A. P. Sen Road প্রিয় 'সেন সাহেবে'র প্রতি লক্ষ্ণৌবাসীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার এ-এক অনন্য নিদর্শন।

১৯৩৩ সালে লিবার‍্যাল পার্টির উত্তর প্রদেশ শাখার অষ্টম অধিবেশন বসে এলাহাবাদে। অতুলপ্রসাদকে অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। তাঁর যোগ্য পৌরোহিত্যে অধিবেশন সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত হয়। ওই অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ হিসেবে অতুলপ্রসাদের বক্তব্য উচ্চ-প্রশংসিত হয়। অতুলপ্রসাদের দীর্ঘ বক্তব্য Indian Annual Register-এ বলা হয়–

The constitutional proposal in the White Paper is certainly not Dominion Status nor any real Self-Government. It is a catalogue of safe guards rather than proposal for the real autonomy.

There has been a dramatic change for the worse since the advent of the Conservative Party and the expression 'Dominion Status' has carefully avoided. He then criticised the various aspect of the White Paper and said, "I deplore separate electorates more than the British dominion has to be maintained no better means could be devised than separate electorates. The scheme makes no provision for self-development. We are not the architects of our own destiny, but suppliants before another nation for favour. No self-respecting Indian can helf feeling humilliation for such an object position."

Proceeding Mr. Sen pleaded for communal unity and reconstruction of Hindu Society whose number were gradually dwindling. Unless the Hindu Society looked sharp, its majority would before long be reduced to a minority.

Mr. Sen praised Mahatma Gandhi for his Harijan movement and wished him success. Revolutionary violence according to Mr. Sen, was morally sinful and politically indefensible. "It should be our endeavour to reclaim raw and impressionable youths form the path of peril."

Concluding Mr. Sen appealed to the Congressmen to withdraw the Civil Disobedience Movement and urged for a union of the progressive parties. He was not one of those, who held that no good had come out of the British connection with Indis.

নিজের পেশার প্রতি অতুলপ্রসাদ ছিলেন সৎ ও আন্তরিক। ফলে সাধারণ মানুষের মতো আইন-ব্যবসায় জড়িত ব্যক্তিরাও তাঁকে খুব পছন্দ করতেন। তিনি আউধ বার অ্যাসোসিয়েশন এবং আউধ বার কাউন্সিলের সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। মানুষের কাছে তিনি এতই প্রিয়ভাজন ছিলেন যে, অবস্থার চাপে কিংবা আন্তর-গরজে যখনই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন, তখনই বিজয়ী হয়েছেন। আউধ বার কাউন্সিলের সভাপতি হিসেবে সবসময় রাজপুরুষেরাই নির্বাচিত হতেন, কিন্তু অতুলপ্রসাদই প্রথম ভারতীয়, যিনি এ-পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। লক্ষ্ণৌ শহরের অন্যতম সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন 'বেঙ্গলি ক্লাব অ্যান্ড ইয়ংম্যান অ্যাসোসিয়েশন'-এরও প্রথম সভাপতি হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন।

এভাবে, কর্ম ও রাজনীতি ক্ষেত্রে, আপন কারয়িত্রী-প্রতিভার ছোঁয়ায় অতুলপ্রসাদ রেখে যান বর্ণাঢ্য এক কৃতিত্বের সম্ভার। একজন গীতিকার হিসেবেই কেবল নয়, এই বিপুল অবদানের প্রেক্ষাপটে শতাব্দীর একজন অন্যতম কর্মীপুরুষ হিসেবেও তাঁকে সহজেই আখ্যায়িত করা যায়।

দর্শন/প্রবন্ধ

# সবই কি পূর্বনির্ধারিত?

.....

সিদ্ধার্থ শংকর জোয়ার্দার

বিজ্ঞান ও দর্শনে এমনকি দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটা বাঁকে এক ধরনের কঠিন প্রশ্ন এসে হাজির হয়: এ বিশ্বজগতের সবকিছুই কি পূর্বনির্ধারিত? প্রশ্নটা এতটাই মৌলিক তথা গুরুত্বপূর্ণ যার বিশেষ সুরাহা খুঁজতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব শাখা-ই মরিয়া। ধর্ম অবশ্য এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় এবং বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। কম যায়নি জ্যোতিষশাস্ত্রসহ হস্তরেখা বিদ্যাও। সোজা কথা ধর্ম-অধর্ম মিলিয়ে এ-ব্যপারে এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে নির্ধারণ-অনির্ধারণের দ্বন্দ্ব পৌঁছেছে একাডেমিক গণ্ডি পেরিয়ে বাস্তব জীবনের পরিচিত গলিতে। আধুনিক বিজ্ঞানও এর সাথে যোগ দিয়ে আগুনে ঘি ঢেলে বিতর্ক জমিয়ে তুলেছে। কাজেই প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছে বিশ্বভূমির সবকিছুই কি আগে-ভাগে ঠিক করা আছে? পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ চার দশকের বামফ্রন্টের ক্ষমতাবসান, প্রবল সাম্রাজ্যবাদ উপেক্ষা করে কিউবায় কমিউনিস্ট শাসনের অব্যাহত ধারা, এমনকি এ-বছরের সবচেয়ে আলোচিত ঘটনাবলির মাঝে ব্রিটেনের রাজপরিবারে নতুন উত্তরাধিকারের আগমন– এসব কি পূর্বনির্ধারিত? নাকি এগুলো নিছক আপাতক ও স্বতঃস্ফূর্ত বিশ্বপ্রকৃতির তাৎক্ষণিক ঘটনাপরম্পরা? ফলশ্রুতিতে অবধারিতভাবে একটা প্রশ্ন এসে দাঁড়ায়– এই বিশ্বটা সুস্থিত কোনো ভদ্রচেহারার গো-বেচারা নাকি ভদ্রচেহারার আড়ালে ঘুমিয়ে থাকা খামখেয়ালি উড়নচণ্ডী কিশোরের ভ্যাপাপনা– এ

নিয়ে দিনের পর দিন নির্ঘুম বিতর্ক শেষ হয়নি। কাজেই মহাবিশ্বের নির্ধারণ সম্পর্কিত এ প্রশ্নের অবতারণা ও তার বৌদ্ধিক পরিবৃদ্ধির সম্ভাবনা ও সংবহনকে উড়িয়ে দেওয়ার উপায় নেই। যদিও দার্শনিক আলোচনার মাঝে নির্ধারণবাদ ও অনির্ধারণবাদের মধ্যে মনোজ্ঞ বিতর্ক আছে তবুও একাডেমিক খোলসের বাইরে এ আলোচনার পরিপুষ্টতার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। কপালের লিখনের উপর ভরসা করে সবকিছু পরিত্যাগ করে ঘরে বসে থাকা মানুষের সংখ্যা নেহাৎই অপ্রতুল। যারা গভীর বিশ্বাস করেন যে, তাদের ললাটের উপর খোদাই করা ভাগ্যলিপি কিছুতেই লেপন করা সম্ভব না, তাদের মুখ দিয়েই শোনা যায়, 'একবার না পারিলে দেখ শতবার'। তাই একথা নিশ্চয় করে বলা চলে মানবজীবন হল এ ধরনের মর্মান্তিক দ্বৈততার সম্মিলিত ও যৌথ পরিবার।

নির্ধারণবাদ এমন চিন্তাধারা সংক্রান্ত মতামতের ইংগিত দেয় যেখানে মনে করা হয় জগতের সবকিছুই নির্ধারিত। মহাশূন্যের সুবৃহৎ উল্কাপতন থেকে শুরু করে গাছের ছোট্টপাতা ঝরা অবধি ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় কর্মধারা এই পরিকল্পিত নির্ধারণ-কাঠামোর অন্তর্বস্তু। হাল আমলে আমরা যে কম্প্যাক্ট ডিস্কে ছায়াছবি ভরে রাখি বিষয়টা তার থেকে কোনো অংশেই ভিন্ন না। মনে করা হয় সৃষ্টির শুরুতেই সর্বজ্ঞ মনের ভিতর যাবতীয় সৃষ্টিলীলা সঞ্চিত ছিল। কাজেই এহেন সৃষ্টিখেলার নিরন্তর দৃশ্যপটগুলো সেই সচেতন মনেরই বিচিত্র কর্মধারা। ধর্মগ্রন্থগুলো বলে আসছে নিখিল বিশ্ব সেই আদি অনন্তের ইচ্ছার প্রকাশ। আদি, অন্ত, ভূত-ভবিতব্য সবই জানেন তিনি। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। তিনি ক্ষয়হীন, সর্বব্যাপী পরমাত্মা। যিনি ধর্মগ্রন্থে পূর্ণ আস্থা রেখেছেন তিনি কি জন্ম, কি মত্যু, কোনো কিছুতে বিচলিত হন না। বিব্রত হন না কোনো স্খলনেও। কারণ জন্ম বা মৃত্যুতে তার নিজের কোনো হাত নেই। তিনি পরাধীন, প্রতিকৃষ্ট। তিনি খেয়ালি মনের আচমকা প্রকাশ। ফলে নির্ধারণবাদ হল এমন একটা দার্শনিক সম্প্রত্যয় যার মাঝে মানুষের ইচ্ছার কোনো স্বাধিকার নেই। বাংলাভাষার চমৎকার একটা প্রবচন উল্লেখ করতে হয় 'যেমন কর্ম তেমন ফল'। আপাতত এটাকে নির্ধারণবাদের মতো মনে হলেও বিষয়টা চমৎকার বিরোধিতায় পূর্ণ। কারণ কে কী কর্ম করবে তা যদি আগেই নির্ধারিত হয়ে থাকে তাহলে নতুন কর্ম করে নতুন ফলাফলের প্রত্যাশা কি অবান্তর নয়? কারো কপালে যদি ব্যাংক ডাকাতির ঘটনা লেখা থাকে তাহলে তার দুষ্কর্মের জন্য নিরর্থক কোর্ট, পুলিশ, আইন-আদালত ইত্যাদির মুখোমুখি করাটা কি প্রকৃতিবিরুদ্ধ নয়? আবার হয়তো এমনও হতে পারে তার বিরুদ্ধে আনীত যাবতীয় কর্মকাণ্ডগুলো ঐ কপালের লিখনেরই অংশ। যদি সমস্ত কর্মকাণ্ডের আদ্যপান্ত সৃষ্টির শুরুতেই কোনো একটা ডিস্কের মধ্যে ভরা থাকে তাহলে তো বলা চলে এখানে যা ঘটছে তা তো সবই পূর্বেই নির্ধারণ হয়ে আছে। আমরা শুধু অভিনয় করে চলেছি মাত্র। কট্টর অদৃষ্টবাদী হয়তো এ কথাই বলবেন। কিন্তু যখনই চিন্তা করা হয় এখানে ছোট্ট ফুলের মতো শিশুও তো প্রায়শই বলাৎকারের শিকার হয়ে চলেছে।

সেটাও কি ঐ ডিস্কে ছিল? তখন অদৃষ্টবাদী বলবেন না, এটা তার অংশ নয়। জঘন্য মানুষের পাপাচার। প্রশ্ন আসবে, তাহলে পাপ ও পুণ্য কী? সবই যদি কর্মলিখন হয় তবে পাপ বলে আলাদা কিছু থাকতে পারে না। থাকা উচিতও না। এ প্রশ্নের কিছুটা উত্তর এসেছে তাদের কাছ থেকেও। বলছেন সবকিছুই নির্ধারিত কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানুষের স্বাধীনতা দেয়া আছে। ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের বিচারিক ক্ষমতা। এ ধরনের ব্যাপার অনেকটা আমাদের দেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো। সরকার টাকা দেন, উপাচার্য নিয়োগ করেন, তদারকিও করেন তবে স্বাধীনতা দেন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে। এ ধরনের উত্তর প্রকারান্তরে সর্বজ্ঞ মনের অধিকার খর্ব করার মতো ব্যাপার। যিনি নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ব্যবহার করেন বা ক্ষমতা ব্যবহারের একমাত্র দাবিদার হন, যার ইশারার আড়ালে কিছুই ঘটে না তিনি আবার এ ধরনের জঘন্য কর্মকাণ্ডের সিদ্ধান্তকে অন্যের কাছে ছেড়ে দিতে পছন্দ করেন। এটা একটা প্যারাডক্সের মতো শোনায়।

কর্ম ও ফলাফলের মাঝে এক অদৃশ্য সমানুপাতিক সম্পর্ক বিদ্যমান মর্মে অনেকে যুক্তি দেখান। প্রায়ই শোনা যায়, চুরি করার পর ধরা পড়লে মানুষ বলে, যেমন কর্ম তেমন ফল। কিন্তু দৃশ্যত এই সমানুপাতিকতার আশ্বাস অনেকের কাছে মিথ্যা সান্ত্ব-না মনে হয়েছে। প্রচুর কর্ম করার পরও ফলাফল না পাওয়ার অনেক দৃষ্টান্ত এ বাক্যের অন্তর্গূঢ় তাৎপর্যকে মর্যাদাহীন করে তুলেছে। সত্যি সত্যি নিষ্ঠার সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আপ্রাণ চেষ্টার পরও ভর্তি হতে না-পারা মেয়ের কাছে এ বাক্যের উপর কতটুকু শ্রদ্ধা থাকবে তা নিশ্চয় কারো অবোধগম্য না। অথচ কম পরিশ্রমের ফাঁকিবাজ ছাত্রের ভালো প্রতিষ্ঠানে ভর্তির খবর পরিশ্রমী ছাত্রীর মনকে কতটা ভারাক্রান্ত করবে তা বোধকরি কারো বলে দিতে হবে না। নির্ধারণবাদের আরেকটা বড় বাসস্থল হল জ্যোতিষশাস্ত্র ও হস্তরেখা বিদ্যা। মহাবিশ্ব সংক্রান্ত একধরনের ধূম্রজাল সৃষ্টি করে সে সম্পর্কে নানারকম ভবিষ্যৎবাণী করার বিচিত্র উদাহরণ এখানে লক্ষ করা যায়। গ্রহ-নক্ষত্র-তিথি গণনা করে ভালোমন্দের যে পূর্বাভাস দেওয়ার রেওয়াজ আজও আমাদের মনের ভিতর গভীর শিকড়ে গ্রথিত তাকে উৎপাটন করা যে-সে কাজ না। সপ্তাহের নিষ্পাপ সাতদিনকে ভালোমন্দের বিভাজন করে বলা হয় 'মঙ্গলে ঊষা বুধে পা যথা ইচ্ছা তথা যা'। অথচ পৃথিবীর কতলোক তথাকথিত শুভদিনে পাঁজি দেখে গৃহত্যাগ করে প্রাণ হারিয়েছেন তার হিসাব কোথায়? হস্তরেখার উপর যে বিদ্যার জন্মলাভ ও প্রসার তা বড্ড আকর্ষণীয়। মানুষের ভবিষ্যৎ জানার জন্য যে কৌতূহল ও বিস্ময় লক্ষ করা যায় তা বিশ্বের যে কোনো উন্মাদনাকে হার মানাবে বলে নিশ্চয়তা দেয়া যায়। ভবিষ্যৎ গণনা যে কারো পেশা হতে পারে এটা ভাবলে অবাক লাগে। অথচ দিনের পর দিন এর প্রসার ও ক্রমবৃদ্ধি ঈর্ষণীয়। টেলিভিশনে ভোরবেলায় অনুষ্ঠানগুলোর মাঝে এখনও সবচেয়ে জনপ্রিয়: সারাদিন কার কেমন যাবে তা রাশি গুণে পট্ পট্ করে বলে দেওয়া। ব্যবসায় উন্নতি, রোমান্স, অর্থপ্রাপ্তি, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়গুলো শুধু একটা

জন্মতারিখ শুনে বলে ফেলার আশ্চর্যজনক ক্ষমতা যিনি অর্জন করেছেন তাকে কেন সরকার আলাদা একটা *গণক মন্ত্রণালয়* খুলে সচিবালয়ে জায়গা দেয় না তা আমার চিন্তায় আসে না।

সকালবেলা পত্রিকা খুলেই রাশিগণনার পাতার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ার দৃশ্য আজ আমাকে বিচলিত করে না। হাতের লেখা বা জন্মতারিখের ভিতর কীভাবে ভাগ্যদশা প্রতিফলিত হয় তা মোটেই যৌক্তিক বলে পরিগণিত হতে পারে না। তবুও কোন বছর ভালো যাবে, কোন বছর মন্দ, খরা-বন্যা, দুর্ভিক্ষ, রাজনৈতিক ইতিকথা থেকে শুরু করে বিশ্বকাপ খেলায় কোনদল জিতবে, কোন দল হারবে তা নিয়ে *ফরচুন টেলারদের* প্রতি মানুষের আগ্রহ ও সমাদর অতুলনীয়। আগে-ভাগে সবকিছু নির্ভুলভাবে (!) জানিয়ে দেয়া আমার এক সহকর্মী নিজে ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকালে নিজের বিজয় নিয়ে যতটা উদ্বিগ্ন দেখেছি অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখে তা দেখিনি। এছাড়া যিনি আপাদমস্তক অদৃষ্টের অমোচনীয় চক্রের পৌনপুনিক কালপ্রবাহের প্রতি আস্থা রেখেছেন তার হাতের সমস্ত আঙুলের ভিতর নানা বর্ণের ভাগ্য পরিবর্তনের পাথরখচিত আংটি দেখেছি। যাইহোক এই মর্মান্তিক দ্বৈততার উপর ভর করে আমরা দেখতে চাই নির্ধারণবাদের প্রকৃত প্রায়োগিক
ক্ষেত্রগুলো কী কী?

## প্রাকৃতিক বিজ্ঞান: কার্যকারণ তত্ত্ব

প্রত্যেক কাজের যে একটা কারণ থাকবে একথা সর্বপ্রথম কে বলেছেন তা স্পষ্ট করে না জানা গেলেও বোঝা যায় অ্যারিস্টটলই সবার আগে এ বিষয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তিনি কারণকে চারটি ভাগে (আকার, উপাদান ও নিমিত্ত) ভাগ করে বলেছিলেন, প্রত্যেক ঘটনা বা বস্তুর পেছনে এই চারটি কারণ বিদ্যমান থাকবে। যেমন আমরা যখন 'অপরাজেয় বাংলা' তৈরি করি তখন তার একটা আকারের কথা ভেবেছি, উপাদান সংগ্রহ করেছি, যে উদ্দেশ্যে এটা বানানো হয়েছে তার পরিকল্পনা করেছি ইত্যাদি। অর্থাৎ ঘটনার পেছনে কারণ অবশ্যম্ভাবী। কারণ বিনে কোনো ঘটনা ঘটতে পারে না। কারণ হল ঘটনার অব্যবহিত আগের বিষয়। এখানে অব্যবহিত শব্দটা এ কারণেই গুরুত্বপূর্ণ যে অতীতের অনেক ব্যাপারই হয়তো কোনো কাজের পেছনে ক্রিয়াশীল থাকতে পারে তবে কারণ হল ঠিক তার আগের ঘটনা। পরীক্ষায় ফেল করার পর বিষপানে আত্মহত্যা করলে মৃত্যুর কারণ হিসেবে ধরতে হবে বিষপান, পরীক্ষায় ফেল করা নয়। বিষপানের কারণ হতে পারে পরীক্ষায় ফেল তাই বলে পরীক্ষায় ফেল মৃত্যুর কারণ নয়। যাই হোক সূক্ষ্ম দার্শনিক বিতর্ক বাদ দিলে এটা পরিষ্কার যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিশেষ করে পদার্থবিজ্ঞানের মূল আবর্তটাই কার্যকারণকে ঘিরে। বিজ্ঞানীরা এমনকি সাধারণ মানুষেরা প্রতিদিন তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে যে অনুমান করে থাকেন তার অন্যতম ভিত্তি (দার্শনিক ভাষায় আকারগত ভিত্তি) এই কার্যকারণ তত্ত্ব।

আগামীকাল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়টা অন্যান্য দিনের মতো ঠিক চিত্তরঞ্জন এভিনিউ-এর মাথায়ই থাকবে এ অনুমানভিত্তিও কিন্তু কার্যকারণ সূত্র। যদি প্রশ্ন করা হয়, আগামীকাল বিশ্ববিদ্যালয়টা কোথায় থাকবে? কেন, অতীতে যে জায়গায় ছিল সেখানেই থাকবে। অতীতে যে জায়গায় ছিল সেখানেই থাকবে কেন? আসলে অতীতে যে জায়গায় ছিল সেখানেই থাকবে এমনতর অনুমান করার ক্ষেত্রে এটা কাজ করেছে যে মহাবিশ্বটা যে যে নিয়মের ভিতর দিয়ে অতীতে প্রবাহিত হয়েছে আগামীকালও তা বলবৎ থাকবে। এর ব্যত্যয় ঘটবে না। এই ব্যত্যয় না ঘটার অনুমান শক্ত করেছে মহাবিশ্বের অতি পরিচিত এক চেহারা যাকে আমরা কার্যকারণ বলে আখ্যা দিয়েছি। তবে এটা ভুললে চলবে না যে এটা একটা স্রেফ অনুমান যাকে যুক্তিবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হচ্ছে *ইনডাকশান*। তবে এমনও হতে পারে, যে নিয়মের টানে বিশ্বটা এভাবে অতি ভদ্র চেহারা বজায় রেখে চলেছে আগামীকাল থেকে তা ঠিক না-ও থাকতে পারে। কাজেই এমনও হতে পারে বিশ্ববিদ্যালয়টা গতকাল চিত্তরঞ্জন এভিনিউর কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকলেও পরশু এটা ঘুরে ঘুরে ওয়ারি কিংবা ধূপখোলায় গিয়ে দাঁড়াবে। আসলে কার্যকারণ তত্ত্বকে যতই নির্ধারণবাদের সুপরিচিত চেহারা হিসেবে বর্ণনা দেওয়া হোক-না কেন এটা হয়তো হতে পারে প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের দুটো ঘটনার বহু পারস্পরিক সংশ্রব থেকে নেহাৎই এক প্রত্যাশা। এটা হয়তো কিছু স্রেফ মনস্তাত্ত্বিক কামনার অব্যাহত ফলাফল। সুবিখ্যাত স্কটিশ দার্শনিক ডেভিড হিউম ঠিক এ ধরনের একটা দার্শনিক প্রত্যয় অতি জোরালোভাবে প্রকাশ করেছিলেন। কার্যকারণ তত্ত্বকে এভাবে ভাবলে হয়তো মনটা ভারী হয়ে উঠতে পারে তবে সেটা যে কিছুতেই অবান্তর নয় তা মনে রাখতে হবে। আপাতত দেখা যাক কার্যকারণ তত্ত্বের সফলতা কতটুকু।

নিউটনের গতিবিজ্ঞান কিন্তু কার্যকারণ তত্ত্বের উপর নির্ভর করেই জগদ্বিখ্যাত হয়েছে। তাঁর গতির সূত্রত্রয় ততক্ষণই কার্যকর থাকবে যতক্ষণ এই পৃথিবীটা সুস্থিত ও সুষম আবর্তের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলবে। মহাকাশে রকেট উৎক্ষেপণ, স্যাটেলাইট প্রেরণ, শত্রু নিধনে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ ইত্যাদি সবই কার্যকারণ তত্ত্বের উপর ভর করে গতিবিজ্ঞানের নিয়ম মেনে সফলতা পেয়েছে। গাণিতিক সূত্রাবলিকে আমরা নির্ধারণের কাঠামোর ভিতর বিচার করে থাকি। যে-কোনো সূত্রই একধরনের ভারসাম্য রক্ষক। যেমন, F=ma, F=G.m1.m2/ d2 ইত্যাদি সূত্রগুলো প্রকৃতি সংক্রান্ত এমন আচরণকে গাণিতিক সংকেতের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করে যার ভিতর আদতে উদ্দেশ্য ও বিধেয় পারস্পরিক পরিবর্তনযোগ্য। সুতরাং বলা যায় এই বিরাট প্রকৃতির মধ্যে যে ঐক্য আছে তার প্রেক্ষিতে একে নিছক খেয়ালি ভাবুক ভাবলে ভুল করা হবে। এটা নিশ্চয় নিয়ন্ত্রিত চেহারার অবগুণ্ঠিত অবয়ব যার ঘোমটা উন্মোচন করলেই ধরা পড়বে ভদ্র বেশ।

## অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদ

প্রতিটা সমাজেরই একটা ভিত্তি আছে। বলাই বাহুল্য এটাই হল অর্থনৈতিক ভিত্তি। এর উপর গড়ে ওঠে উপরিকাঠামো। সাহিত্য, ধর্ম, শিল্পকলা, দর্শন, ভাবাদর্শ ইত্যাদিই এই উপরিকাঠামো। সোজাসাপটা বলতে গেলে ভিত্তি উপরিকাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করে। একটা সমাজের সাহিত্য, শিল্পবোধ অথবা দর্শন কেমন হবে তা পুরোপুরি নির্ভর করছে ঐ কাঠামোর উপর। কার্ল মার্ক্সের অর্থনৈতিক দর্শনকে অনেকে সমালোচনা করেছেন অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদ বলে। তবে সমালোচনা যাই হোক এটা স্বীকার করতেই হবে পৃথিবীর নানাবিধ সমাজবাস্তবতায় এক-এক ধরনের সামাজিক অবস্থান পরিলক্ষিত হওয়ার কারণ ঐ দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো এক-এক ধরনের বলে। আমাদের দেশের আর্থিক কাঠামো পরিবর্তনের সাথে সাথে দেশের মানুষের সামাজিক সম্পর্কের যে বিরাট পরিবর্তন লক্ষণীয় তা এককথায় অভাবনীয়। দেশের অনেক মানুষেরই আর্থিক সামর্থ্যের বিরাট পরিবর্তন হয়েছে, ফলে পাল্টে গেছে তাদের জীবনাচার, অনেকটা সংস্কৃতিও। এখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া কোনো সন্তানেরই তার বাবার সাথে যোগাযোগের জন্য সাতদিন ধরে অপেক্ষা করতে হয় না একটা চিঠির জন্য। কাউকে সত্যিকার অর্থে এখন বোঝানো শক্ত যে বিদেশে থাকা বন্ধুর সাথে যোগাযোগ করতে একগাদা টাকা আর দেড়মাস ধরে অপেক্ষা করতে হত কয়েক বছর আগেও। যেটা এখন চোখের পলকে ঘটে যায় তা নিয়ে রীতিমতো মহাভারত রচনা করতে হত একসময়। এটার কারণ বৈশ্বিক কাঠামো পরিবর্তন। আর এই পরিবর্তনটা সম্ভব হয়েছে আর্থিক সামর্থ্য অর্জনের ফলে। সুতরাং অর্থ নির্ধারণ করেছে সামাজিক বাস্তবতা, যাকে আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ছাড়া আর কী-বা বলা যায়?

## সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণ

প্রতিটা মানুষেরই সংস্কৃতি নির্ধারিত হয়ে থাকে সে যে সমাজবাস্তবতায় বেড়ে ওঠে তার উপর। সুদূর বিলেতে গিয়ে সিলেটের আঞ্চলিক ভাষা ভুলতে না পারার ঘটনা প্রকাশ করে মানুষ কতটা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সংস্কৃতি পরিহার করতে পারা সহজ নয়। এটা গড়ে ওঠে অতি ধীর ও ধারাবাহিক জীবনাচারের মধ্য দিয়ে। সেদিন এক সহকর্মীকে দেখলাম অতি আঞ্চলিক ভাষায় টেলিফোনে কথা বলছেন যদিও কোনোদিন তাকে প্রমিত উচ্চারণ ছাড়া কথা বলতে শুনিনি। জিজ্ঞেস করতেই বললেন, মা'র সাথে কথা হচ্ছিল। মা'র সাথে কৃত্রিমতা চলে না, তাই বেরিয়ে আসল প্রকৃত সংস্কৃতি। কাজেই যে যে পরিবেশে বড় হন, বেড়ে ওঠেন, স্বপ্ন দেখেন সে পরিবেশই ঠিক করে দেয় তার সামগ্রিক জীবনবোধ। রাসেল লিখেছেন, একবার তিনি এস্তোনিয়া থেকে অনাহারক্লিষ্ট দুই শিশুকে নিয়ে বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। কোনোকিছু ঘাটতি ছিল না তাদের। তারপরও সুযোগ পেলেই তারা পাশের ক্ষেতে যেত আলু চুরি করতে। ঢাকা শহরে যারা চলাচল করেন তাদের ভাষা ও চলাচলের ধরন দেখলেই

বোঝা যায় তারা কোন জেলার বাসিন্দা। নতুন ঢাকার হালফ্যাশানের বাড়িগুলোর মানুষের সাথে সরু, চিপা নাজিমুদ্দিন রোডের মানুষের জীবনাচারের কত-না পার্থক্য! কাজেই সমাজ, পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা মানুষকে যে চরমভাবে নিয়ন্ত্রণ করে তা বোধকরি না-বললেও চলবে।

## জেনেটিক নিয়ন্ত্রণ

সমকালীন জেনেটিক বিদ্যা জীবকুলের জন্য বিরাট একটা আবিষ্কার ঘটিয়েছে। আবিষ্কারটা মানুষের জিন মানচিত্র উদ্ধার। শোনা যাচ্ছে এটা এমন একটা শাখা যা মানবচরিত্রের আদ্যোপান্ত উদ্ধার করতে সক্ষম। চরিত্রের গঠন কেমন হবে, ব্যক্তিত্বে কতটুকু প্রখরতা থাকবে, কোন বয়সে কে-কী রোগে আক্রান্ত হবে তা-নাকি ঐ জটিল মানচিত্রের মাঝেই লুকিয়ে থাকবে। শুধু গোপন কিছু কোড উদ্ধার করলেই হবে। মানব ইতিহাসের মাঝে এর থেকে বড় সফলতা আর কী? সংগত কারণেই মনে হচ্ছে, প্রতিটা প্রাণীরই জীবনের সামগ্রিক পরিণতি ঐ এক অদৃশ্য সুতোতেই গাঁথা; শুধু তার পড়ার ভাষা জানলেই হবে। জীবনটা এ-প্রেক্ষিতে কতটা নিয়ন্ত্রিত তা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে? রুশো বলেছিলেন, মানুষ যখন জন্মায় তখন সে থাকে মুক্ত কিন্তু পরে সে হয়ে পড়ে চারিদিক দিয়ে শৃঙ্খলিত। এই বন্ধন বা শৃঙ্খলা তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রকৃতপক্ষে মানুষ সমাজবদ্ধ প্রাণী হিসেবে নানাভাবে শৃঙ্খলায় আবদ্ধ। সমাজ, রাষ্ট্র, গোষ্ঠী, পরিবার ইত্যাদি দ্বারা ভয়ংকরভাবে সে শৃঙ্খলজালে বন্দি। প্রতিদিন তার ইচ্ছার কতটা অবদমন করতে হয় তা ব্যক্তিমাত্রই জানেন। খাওয়ার ইচ্ছা, স্পর্শের ইচ্ছা, ঘ্রাণের ইচ্ছা, নিজেকে বিস্তৃত করার ইচ্ছা, সর্বোপরি মানুষ হিসেবে নিজেকে সমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার ইচ্ছাকে প্রতিদিন গলা টিপে হত্যা করতে হয়। এই বিরাট সামাজিক-রাষ্ট্রীয়-পারিবারিক বাস্তবতাকে উপেক্ষা করার শক্তি কার?

জীবনের এতটুকুই কি সব? মানুষ কি স্বাধীন না মোটেও? জগৎটা কি শুধুই নির্ধারিত? আগেই বলেছি আধুনিক বিজ্ঞান বিশেষ করে পদার্থবিজ্ঞান এ বিতর্কে অংশ নিয়ে বেশ জমিয়ে তুলেছে। বিষয়টা পরিষ্কার করা যাক। আইনস্টাইন গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন এই মহাবিশ্বটা সুস্থিত ও সবদিক দিয়ে সুশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ। এখানে যা ঘটে চলেছে তার মূল সূত্রটা অনুধাবন করা অসম্ভব কিছু নয়। প্রকৃতিতে যাদৃচ্ছিক কিছু ঘটে না। যা ঘটে তা বলতে গেলে পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলোকে ঠিক-ঠাক অনুসরণ করে। অন্য কথায় প্রকৃতির আচরণ এতটাই সমরূপ যে একে ছোট্ট একটা সমীকরণ দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব। তিনি আরও বিশ্বাস করতেন হয়তো অচিরেই এমন একটা সূত্র আবিষ্কার হয়ে যাবে যা দিয়ে প্রকৃতির আপাদ-মস্তক সব ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে। তিনি এমন একটা সূত্র কল্পনা করে নাম দিলেন মহান সর্ববিধ তত্ত্ব (Grand Unification Theory)। বিজ্ঞানীরা বহুদিন ধরে হিসাব করে দেখেছেন প্রকৃতি নিজেকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ করলেও এর অন্তরে আছে গভীর ঐক্য। সোজাকথায়

এক ও অদ্বিতীয় ইচ্ছার নানান প্রকাশ এই প্রকৃতি। সুতরাং এই অপরিচিত প্রকাশই পরিচিত চরিত্রের নানান ব্যঞ্জনা।

বিষয়টা চলছিল ভালোই কিন্তু গণ্ডগোল বাঁধল তার কিছু পরে বিশেষ করে পদার্থবিজ্ঞানের আরেকটা শাখা কণাবাদী বলবিদ্যা (Quantum mechanics)-এর আবির্ভাবের ফলে। আইনস্টাইন নিজেও এই নতুন পদার্থবিজ্ঞানের জন্মলাভে ভূমিকা রেখেছিলেন তবে পরবর্তীতে এর অনেক দার্শনিক প্রত্যয়ের সাথেই একমত হতে পারেননি। শুরু হল বিরাট ঝঞ্ঝাট। নীল্‌স বোর, যিনি ছিলেন এই কণাবাদী বলবিদ্যার মূল নায়ক, তার সাথে বাঁধালেন তুমুল ঝগড়া। পদার্থবিজ্ঞানের মাঝে সে ঝগড়া যে কতটা মূল্যবান তা বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে সবারই জানা। এ প্রসংগে আরেকজনের নাম করতেই হবে যিনি ছিলেন সুবিখ্যাত জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী হাইসেনবার্গ। তাঁর চিন্তা গিয়ে ঠেকল পদার্থবিজ্ঞানের অতি ক্ষুদ্রতম রাজ্যের অস্থির চরিত্রের অতি ক্ষুদ্র কণিকা ইলেকট্রনের উপর। ইলেকট্রন কণা এতটাই বেয়াড়া চরিত্রের যার হদিস পাওয়া অতি দুঃসাধ্য। কিছুতেই তার অবস্থান ও ভর একসাথে নিশ্চিত হওয়া যায় না। এ-যেন সৈয়দ মুজতবা আলীর *রসগোল্লা* গল্পের নায়ক ঝান্টুদার চরিত্রের মতো। তিনি এতবার বিদেশ যাতায়াত করেন যে কিছুতেই বোঝার উপায় নেই তিনি বিদেশে যাচ্ছেন না আসছেন। ইলেকট্রনের এই খেয়ালি অবাধ্য চেহারার জন্য তার ভর ও বেগ বিজ্ঞানীদের কাছে অধরাই রয়ে গেল। কী যে এক মসিবত! একবার এক প্রধানমন্ত্রী চাইলেন তার সচিবালয় কেমন চলছে তার নিজের চোখে দেখবেন। সিদ্ধান্ত নিয়ে জানিয়ে দিলেন এক সপ্তাহ আগে। এক সপ্তাহের মাঝে সব অনিয়ম উধাও। প্রধানমন্ত্রী গেলেন বটে কিন্তু সচিবালয়ের আসল চেহারা দেখতে পেলেন না। এর পর অন্য একজনের পরামর্শে প্রধানমন্ত্রী গেলেন ছদ্মবেশে। বেচারা দারোয়ান না চেনায় তাকে সচিবালয়ে ঢুকতেই দিল না। প্রধানমন্ত্রীর আসলে সচিবালয়ের আসল চেহারা কোনোদিন দেখা-ই হয়ে উঠল না। সচিবালয়ের মতো ইলেকট্রনেরও প্রকৃত চেহারা বিজ্ঞানীদের কাছে তাই অধরাই হয়ে থাকল। তাহলে পদার্থের অতি ক্ষুদ্র রাজ্যে কী এক মর্মান্তিক অনিশ্চয়তা। যদি ঐ ক্ষুদ্ররাজ্যেই এতটা অনিশ্চয়তা থাকে তাহলে না জানি এতবড় মহাবিশ্বে কতটা অনিশ্চয়তা আছে। আমরা সেটা টের পাই না কেন? টের পাই না এজন্য যে, যখন আমরা এক কুইন্টাল চাল কিনি তখন দোকানদার দুই, চার, দশ কেজি কম দিলেও ধরতে পারিনে কিন্তু এক কেজি চালে একশ গ্রাম এদিক-ওদিক হলেই নিস্তার নেই। আর স্বর্ণের জিনিস কিনতে গেলে এক রতি কম দিলে তো দোকানির ব্যবসায়ই লাটে! ব্যাপারটা ঠিক সেরকম। মহাবিশ্বটা মোটাদাগে হয়তো অনেকটা সুশৃঙ্খল মনে হবে কিন্তু এর একান্তে এতটাই বেয়াড়াপানা ঘুমিয়ে আছে যাকে বুঝতে লাগবে অন্তর্দৃষ্টি।

এই জগৎটাকে আমরা যতটা বুঝি তাতে করে বলা চলে সবদিক দিয়েই অনিশ্চয়তায় পরিপূর্ণ। প্রতি মুহূর্তেই নতুন, প্রতিটিক্ষণই স্বতঃস্ফূর্ত। যে নির্ধারণের

নৌকায় সাগরে পাড়ি দিচ্ছিলাম তা শত ছিদ্রে বেসামাল। এক উদ্ধারহীন ভয়াবহ ও অনির্দিষ্ট গন্তব্যে আমাদের এ যাত্রা। শোনা যায় অনেকে নাকি আমাদের এই সৌরজগৎকে তুলনা করেছেন বহু বিশৃংখলার মাঝে আচমকা একটা সুশৃংখল কিছু তৈরি হওয়ার সাথে। একদল বানরের হাতে টাইপরাইটার দেওয়ার পর এবড়ো-থেবড়ো টাইপ করতে গিয়ে রীতিমতো এক সনেট টাইপ হয়ে যাওয়ার মতো ব্যাপার! সৌরজগতের এই দৃশ্যত সুবিন্যাস হয়তো হতে পারে এই বিক্ষিপ্ত নভোমণ্ডলের অতি ক্ষুদ্র অংশের মাঝে সুসংস্থিত অবয়ব।

এছাড়া সবদিক দিয়ে বিচার করলে এখানে বহুমাত্রিক অনিয়ম লক্ষণীয়। কোনোমতেই পূর্বনির্ধারিত মেনে নিতে মনটা সায় দেয় না। এই অনিয়ম, বৈষম্য, বিরোধ, সংঘর্ষ ও সামগ্রিক বিচিত্রতা নিয়েই এই মহাকাণ্ড। এখানে কোনো দয়া, অনুগ্রহ, অনুকম্পা নেই। সৃষ্টির অনাবিল নেশা ও অস্তিত্বের নিরন্তর যুদ্ধের মধ্য দিয়েই এই মহাযাত্রা। বিশ্বটা হয়তো অনেকাংশেই শক্তিমানের। প্রতিদিন খাদ্যতালিকায় সবলদের পেটে কত দুর্বল প্রাণের প্রাণবিয়োগ ঘটে তার খবর কে রাখে? সৃষ্টির শুরু থেকেই এই খেলা চলেছে অহরহ। এসব বিষয়কে পূর্বনির্ধারিত ভাবতে মনটা ভারি হয়ে ওঠে।

অনেকের মতে বিশ্বজগৎটা পুরোপুরি অনির্ধারিত। এখানে কোনো কিছু ঘটার আগে বলা যায় না কী ঘটবে। যা ঘটে চলেছে তা অভাবনীয় ও অকল্পনীয়। কিছুতেই পূর্বাধিগম্য নয়। এটা স্বতঃস্ফূর্ত ও তাৎক্ষণিক। প্রকৃতি তার আপন খেয়ালে অন্ধ আবেগে ছুটে চলে গন্তব্যহীন এক অজানা মহালোকে। কেউ অনুমান করতে পারবে না কী উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এই ব্যস্তময় পরিক্রমা। বলা যায় এটা একটা পারিসাংখ্যিক ব্যাপার। সবকিছুই সম্ভাবনা। আমরা একটা সম্ভাবনার মহাবিশ্বে বাস করি। কেউ যদি লটারির সবগুলো টিকিটই কিনে নেই তাহলে তার সব পুরস্কার পাওয়া নিশ্চিত। সেখানে কোনো সম্ভাবনার ব্যাপার নেই। আবার কেউ যদি ঐ লটারির কোনো টিকিটই না কেনে তাহলেও তার পুরস্কার না-পাওয়া নিশ্চিত। সেখানেও কোনো সম্ভাবনা নেই। সম্ভাবনা তৈরি হয় কোনো একটা নির্দিষ্ট ফ্রেম অব ইফেক্টস-এর মধ্যস্থলে। আমরা প্রত্যেকেই এ ধরনের ফ্রেমের ভিতর দাঁড়িয়ে আছি সম্ভাবনার দোরগোড়ায়। এই সম্ভাবনার মাত্রা কম না বেশি তা নির্ভর করে আপতিক কিছু চালকের উপর। সোজা কথায় তা ক্ষণিক পরিস্থিতি ও সুযোগ কাজে লাগানোর প্রচেষ্টার উপর। কেউ যদি ঘরের ভিতর শুয়ে থাকে তাহলে তার গাড়িতে চাপা পড়ে মৃত্যুর সম্ভাবনা শূন্য, থাকতে পারে ছাদ ধসে মৃত্যুর সম্ভাবনা। যখনই একজন গাড়িতে চেপে বসে তখনই সে একটা দুর্ঘটনার ফ্রেমের ভিতর ঢুকে পড়ে। সেটা হতেও পারে, না-ও পারে। যদি গাড়িটি বেপরোয়া চলে অথবা যন্ত্রাংশে ত্রুটি দেখা দেয় তাহলে এ ঝুঁকি যায় আরো বেড়ে। তারপরও হয়তো গাড়িটি দুর্ঘটনা ঘটলে অনেকে প্রাণে বেঁচে যায়, মৃত্যু হয় অনেকের– সেটাও নির্ভর করে পরিস্থিতির উপর। এখানে অলৌকিকতা বলে কিছু নেই।

পরিশেষে বলব এই মহাবিশ্বে নির্ধারণ ও অনির্ধারণের পক্ষে যে যুক্তি ও মতামত আছে তা দুটোই সত্য। তবে মনে রাখতে হবে নির্ধারণ বলতে কোন কোন বিষয়গুলোকে নির্দেশ করা হচ্ছে, খুব বড় স্কেলে ভাবলে জগৎকে বড্ড সুবোধ ও সুসংস্থিত মনে হবে। খুব বেশি ইতরবিশেষ ঘটেনা। এখানে যদিও মাঝে মাঝে আশংকা জাগে মহাবিশ্বটা বিশেষ বিশেষ ঘটনার মুখোমুখি হয়ে প্রলয়ের মহাঅন্ধকারে ডুবে যাবে। বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ হয়তো অঙ্ক কষে এই মন খারাপের বার্তা প্রকাশ করেন (২০০০ সালের ৫ মে মহাবিশ্ব প্রলয়ের যে আশংকা ছিল)। তবে এটা ঠিক, যে প্রাণীসকল এই অপূর্ব মহাবিশ্বের যাত্রী তাদের বেঁচে থাকার জন্য যে ভারসাম্য দরকার তার বিন্দু-বিসর্গ এদিক-ওদিক হলে নিস্তার নেই (নাইট্রোজেন বা অক্সিজেন ইত্যাদির মাত্রা)। সেদিক থেকে বলা যায় আমাদের পরিচিত এই ভূখণ্ডটি হয়তো কোনো একটা নির্ধারণকাঠামোরই অংশ। তবে এটাও ঠিক এই সুপরিচিত ও অতিপ্রয়োজনীয় মহাবিশ্বকে আমরা একদিন হারিয়ে ফেলব। সেদিন অন্তত সূর্য নামক নক্ষত্রটি আলো দিতে দিতে সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে পড়বে। সমস্ত হাইড্রোজেন পুড়ে হিলিয়ামগুলো মহাকাশে মিলে যাবে। হয়তো আবারও কোনো এক অজানা নক্ষত্রকে ঘিরে এমনি করে প্রাণের মেলা বসবে। অনন্ত মহাকালের গর্ভে হয়তো জন্ম নেবে এ-রকম কিংবা অন্যরকম কোনো প্রাণী। সেদিনও এই একই প্রশ্ন থাকবে, সবই কি পূর্বনির্ধারিত?

শি ক্ষা / প্র ব ন্ধ

# শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য

.....

ব দ রু দ্দী ন উ ম র

মানবসমাজে বৈষম্যের ধরন অনেক। তবে সব থেকে বড়ো বৈষম্য হল, শ্রেণিবৈষম্য। অন্য সব বৈষম্য হয় এর থেকেই সৃষ্ট অথবা অল্পবেশি এর সাথে সম্পর্কিত। শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য এদিক দিয়ে কোনো ব্যতিক্রম নয়।

বাঙলাদেশে এখন শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য নিয়ে কিছু আলোচনা, ছোটখাট আন্দোলন, দাবিদাওয়া পেশ ইত্যাদি হয়ে থাকে। এই আলোচনা, আন্দোলন ও দাবিদাওয়াগুলোর প্রতি লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, এগুলোর খুব স্পষ্ট শ্রেণিচরিত্র আছে। সাধারণ বুদ্ধিজীবী, হোমরা চোমরা শিক্ষাবিদ থেকে নিয়ে ছাত্র সংগঠন পর্যন্ত প্রায় সকলেই বৈষম্যের ব্যাপারে উচ্চমাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মধ্যেই নিজেদের বক্তব্যকে প্রধানত সীমাবদ্ধ রাখেন।

এসব ক্ষেত্রে বৈষম্য অবশ্যই আছে এবং এই বৈষম্যের মাধ্যমে এ দেশে একটি বিশেষ সুবিধাভোগী 'উচ্চ' শ্রেণি গঠন ও তার শিক্ষাগত বুনিয়াদ পাকা করারই ব্যবস্থা হয়। তবে এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, এই বৈষম্য আবার হল সামগ্রিকভাবে এ দেশের সুবিধাভোগী নতুন বুর্জোয়াশ্রেণির কাঠামোর মধ্যেকার একটি ব্যাপার। এই বৈষম্যের সাথে দেশের কোটি কোটি ছেলেমেয়ের জীবন ও শিক্ষার কোনো সম্পর্ক নেই। এই সম্পর্কহীনতার মূল কারণ, শিক্ষাক্ষেত্রে যতপ্রকার বৈষম্য আছে তার মধ্যে সবথেকে বড়ো বৈষম্য হল একদিকে দেশের সব থেকে সুবিধাপ্রাপ্ত অতি অল্পসংখ্যকের উচ্চতম শিক্ষা এবং অন্যদিকে কোটি কোটি ছেলেমেয়ের নিরক্ষরতা অথবা নাম-কে-ওয়াস্তে প্রাথমিক শিক্ষা।

বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত 'শামসুল হক শিক্ষা কমিশন'-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে, "আমাদের সংবিধানে স্পষ্টভাবে সমমানের সর্বজনীন মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে অন্তত প্রাথমিক স্তরে সবার জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে একই মান ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একই ধারার শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি করা আবশ্যক"। (পৃ. ৪৩)

বাঙলাদেশের সংবিধানে এই গালভরা 'অঙ্গীকার' সত্ত্বেও ১৯৭২ সাল থেকে আজ পর্যন্ত কোনো সরকারই 'সমমানের সর্বজনীন মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত' করার জন্য নিম্নতম কোনো পদক্ষেপও গ্রহণ করেনি। সেটা না-করার কারণ, এই তথাকথিত বাকসর্বস্ব অঙ্গীকারের সাথে লুণ্ঠন ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে গঠিত বাঙলাদেশের নব্যধনিক শাসকশ্রেণির স্বার্থের কোনো সম্পর্ক নেই। শুধু তাদেরই নয়, সামগ্রিকভাবে এ দেশের নবগঠিত মধ্যশ্রেণির লোকদের সাথেও এই 'অঙ্গীকারের' বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই, তাদেরও এ বিষয় নিয়ে বিশেষ কোনো মাথাব্যথা নেই। বৈষম্য বলতে তারা সুবিধাভোগী শ্রেণীর মধ্যেকার বৈষম্যই প্রথমত বুঝে থাকে। এ কারণে মধ্য শ্রেণিকাঠামোর মধ্যে অবস্থিত রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এমনকি ছাত্রসংগঠন পর্যন্ত এই বৈষম্য নিয়ে বিশেষ কথাবার্তা বলতে অথবা আলোচনা ও আন্দোলন করতে আগ্রহী নয়। তাদের কাছে বৈষম্য দূর করার অর্থ শুধু ক্যাডেট কলেজ, ইংরেজিমাধ্যম স্কুল, মাদ্রাসা, সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বিরাজমান বৈষম্যের অবসান ঘটানো। বৈষম্য সম্পর্কে এদের এমনই ধারণা যে, এর দ্বারা তারা অনেকেই বোঝে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা পাওয়া অথবা না-পাওয়ার মধ্যে

বৈষম্য! এ কারণে বৈষম্য দূরীকরণের জন্য এদের এক অংশের দাবি হল, বাঙলাদেশের প্রত্যেকটি জেলায় নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন!!

উচ্চশিক্ষা, এবং যথাযথ উচ্চশিক্ষা, যে কোনো সমাজের জন্য অবশ্যই দরকার। শুধু তাই নয়, উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণও দরকার। কিন্তু যারা এ দেশে উচ্চশিক্ষার সংকুচিত অবস্থা নিয়ে মাতামাতি করেন তাঁরা একথা ভুলে যান যে, শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয়-এর অনেক বড়ো অংশ এখন উচ্চশিক্ষা খাতেই হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার যে, এই অংশ ব্যয় করা হয় শিক্ষার্থীদের একটা খুবই ছোট অংশের জন্য। অর্থাৎ তাদের পিছু ব্যয়-এর পরিমাণ একটা বড়ো অঙ্ক।

যাঁরা এখন উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণের নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের পর বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দাবি করেন, তাঁরা যে সর্বজনীন শিক্ষা অথবা দরিদ্রদের শিক্ষার বিরোধী তা নয়। তবে তাঁরা মুখে যাই বলুন বাস্তবত তাঁদের কাছে সার্বজনীন শিক্ষার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্প্রসারণের গুরুত্ব ঢের বেশি। একথা বিশেষভাবে সত্য যাঁরা জেলায় জেলায়, প্রত্যেক জেলায়, এখন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবি তোলেন।

তাঁদের এই দাবির অর্থ হল, বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষার জন্য যে ব্যয় এখন হচ্ছে সে ব্যয় এখনই অন্তত আরও দশগুণ বৃদ্ধি করা! এই বৃদ্ধি যদি সম্ভবই হয় তাহলে বিদ্যমান প্রাথমিক ও নিম্নমাধ্যমিক শিক্ষার কী হবে? সে খাতে এখন যেখানে ব্যয় অতি সামান্য সেখানেও কি ব্যয়বৃদ্ধি হবে? সেখানেও কি শিক্ষার সম্প্রসারণ হবে? না বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা, সাধারণভাবে উচ্চশিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতে গিয়ে দরিদ্রের প্রাথমিক ও নিম্নমাধ্যমিক শিক্ষা আরও ভীষণভাবে সঙ্কুচিত হবে, প্রায় ভেঙে পড়ার উপক্রম হবে?

এভাবে কথাটি বলার কারণ শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি যে কোনো ক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য অর্থসম্পদের প্রয়োজন এবং আমাদের মতো দেশে এর একটা সীমাবদ্ধতা আছে। এই সীমাবদ্ধতার কথা বাস্তবত চিন্তা না-করে কর্মসূচি হাজির করার অর্থ আলাউদ্দীনের চেরাগের ওপর ভরসা করা!

বাঙলাদেশের জনসংখ্যার তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা, তার ছাত্রসংখ্যা নিঃসন্দেহে কম। কিন্তু কথা হল, এই কমসংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, প্রকৌশল ও চিকিৎসা কলেজ থেকে পাশকরা ছাত্ররা কি ঠিকমতো শিক্ষা পাচ্ছে? শিক্ষাশেষে কি তাদের কর্মসংস্থান হচ্ছে? তাদের মধ্যে যারা বিভিন্ন কারণে তুলনামূলকভাবে ভালো শিক্ষা পাচ্ছে তাদের জন্য কি দেশে উপযুক্ত কর্মসংস্থান হচ্ছে? তাদের দেশত্যাগ বন্ধ করার কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ কি সম্ভব হচ্ছে?

এ সব মোটেই হচ্ছে না। কারণ এদেশে প্রকৌশলী ও চিকিৎসকদের অল্প সংখ্যকের জন্যই চাকরির সংস্থান আছে। তাছাড়া চাকরি থাকলেও তার শর্ত এমন যে, চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে হাসপাতালে ওষুধ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অভাবে ঢাকাসহ অন্যান্য শহরে তো বটেই, বিশেষত ঢাকা শহরের বাইরে গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসার কোনো সুযোগ চিকিৎসকদের নেই। এ কারণে যারা পেশাগত সততার

কারণে ঠিকমতো চিকিৎসা করতে ইচ্ছুক তারাও হতাশ হয়ে অনেকে দেশ ছাড়ছে। সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রকৌশল ও চিকিৎসা কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি শিক্ষাকেন্দ্র থেকে শিক্ষালাভ করে তারা দেশত্যাগ করার মাধ্যমে আমাদের দেশের অর্থসম্পদ ও মানবিক সম্পদ দুই-ই পাচার করছে বাইরে, বিশেষত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোতে এবং সেখানে গিয়ে তারা সেখানকার অর্থনীতি, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রের সেবা করছে। অথচ এই দেশত্যাগকারীদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমাদের দেশের গরিব শ্রমজীবী, মধ্যবিত্ত শ্রমজীবীদের উৎপাদিত উদ্বৃত্ত থেকে এক-এক জনের জন্য দুই চার পাঁচ সাত লক্ষ টাকা পর্যন্ত খরচ হয়ে থাকে। কাজেই এদিক দিয়ে দেখলে আমাদের দেশের শিক্ষানীতি, কর্মসংস্থান নীতি মূলত সাম্রাজ্যবাদের প্রায় সরাসরি খেদমতেই নিয়োজিত আছে। যত সংখ্যক বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, চিকিৎসক, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, জাপান ইত্যাদি দেশে ও অঞ্চলে চলে যাচ্ছে এবং সেখানকার উন্নয়নে অবদান রাখছে তেমনসংখ্যক এইরকম শিক্ষিত লোকদের শিক্ষার জন্য তাদেরকে যে অর্থসম্পদ ব্যয় করতে হত সেটা তাদের বদলে আমরাই ব্যয় করছি। এ কারণেই এই প্রক্রিয়া শুধু মানবিক সম্পদ নয়, আমাদের অর্থসম্পদও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোতে পাচার করার একটি নিয়মিত প্রক্রিয়ায় এখন পরিণত হয়েছে।

এক্ষেত্রে সব থেকে বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে চিকিৎসাক্ষেত্রে। বাঙলাদেশে আজ কোনো ধরনের লোকের জন্যই চিকিৎসার তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই। অর্থনীতির নিয়ম অনুযায়ী, চাহিদা ও সরবরাহের নিয়ম অনুযায়ী এদেশে চিকিৎসকদের এমন রাজত্ব কায়েম হয়েছে যে, তাঁদের বিপুল অধিকাংশই সঠিক চিকিৎসার পরোয়া না করে দু-তিন-চার মিনিটে এক-একটি রুগী দেখে তিন-চারশো করে টাকা পকেটস্থ করেন। ব্যক্তিগত পরিচয় ও যোগাযোগ না-থাকলে তাঁদের মনোযোগ লাভ করা ও তাঁদের থেকে চিকিৎসা পাওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া এ চিকিৎসাব্যবস্থা ও উচ্চমধ্যবিত্ত এবং ধনীদের জন্য। তবে দেশের এমনই অবস্থা, এবং ডাক্তারদের রোজগারের এমনই অনায়াস ব্যবস্থা যে, শুধু টাকা খরচ করলেই যে এখানে সব থেকে সম্ভাব্য ভালো চিকিৎসা কারো জন্য নিশ্চিত হবে এমন নয়। অর্থের সাথে যদি রাজনৈতিক ক্ষমতাও থাকে একমাত্র সেই অবস্থাতেই সে চিকিৎসালাভ সম্ভব। কিন্তু সেই অবস্থাতেও চিকিৎসা এখানে প্রায়ই ঠিকমতো সম্ভব নয়, কারণ চিকিৎসকদের চিকিৎসা-দক্ষতা খুব সীমিত। এক্ষেত্রে উচ্চতর দক্ষতার জন্য যেভাবে পড়াশোনা করা দরকার, যেভাবে রুগীদের প্রতি মনোযোগ দিয়ে তাদেরকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা দরকার, তার কিছুই তাঁরা করেন না। কাজেই বিদ্যা অথবা অভিজ্ঞতা কোনোটিই, চিকিৎসাব্যবসার সাথে জড়িত থাকা সত্ত্বেও, তাঁরা অর্জন করতে পারেন না।

কয়েক বছর আগে বাঙলাদেশে চিকিৎসকদের কর্মসংস্থানের অভাবের কারণ দেখিয়ে চিকিৎসা-কলেজে ছাত্রভর্তি বন্ধ করার নীতি সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়! যে দেশে প্রয়োজনের তুলনায় শতকরা এক ভাগও হাসপাতাল ও চিকিৎসাকেন্দ্র নেই, যে দেশে জনগণের চিকিৎসার জন্য আরও লক্ষ লক্ষ চিকিৎসক দরকার, সেখানে কর্মসংস্থানের অভাবের কথা বলে চিকিৎসা-কলেজে ছাত্রভর্তি বন্ধ করার চিন্তা যে কত বড় ক্রিমিনাল কাজ তা খুব সহজবোধ্য। সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে আন্দোলন শুরু হলে সরকার শেষপর্যন্ত তাদের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ ধরনের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে শুধু একটি বিশেষ সরকারকেই নয়, এ দেশের সমস্ত শাসক-শ্রেণিরই চরিত্র স্পষ্টভাবে উন্মোচিত হয়।

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা খুব জোরের সঙ্গেই বলা দরকার যে, উচ্চশিক্ষার জন্য ব্যয় বৃদ্ধি একটি ক্ষেত্রেই জরুরি, এবং সেটি হল চিকিৎসাক্ষেত্রে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসংখ্যা যদি বৃদ্ধি করতে হয় তাহলে বর্তমানে পরিস্থিতিতে চিকিৎসা-কলেজ ও চিকিৎসা-স্কুল এবং সেই সাথে নার্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের ক্ষেত্রেই তার জন্য সর্বোচ্চ বরাদ্দ দরকার। এর দ্বারা একদিকে উচ্চশিক্ষা এবং অন্য দিকে জনগণের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আয়োজন দুই-ই সম্প্রসারিত হবে। এখানেই শেষ নয়, এর জন্য শহর ও গ্রামাঞ্চলে হাসপাতালের সংখ্যাও ক্রমাগতভাবে বড়ো আকারে বৃদ্ধি করতে হবে।

এই কাজের জন্য অর্থব্যয় বৃদ্ধির দাবি না-করে প্রত্যেক জেলায় একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার দাবি যে উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণের নামে মধ্যশ্রেণির ওপরতলার লোকদের সুবিধাবৃদ্ধি তাতে সন্দেহের কারণ নেই। তাছাড়া শিক্ষার জন্য যে অর্থ বরাদ্দবৃদ্ধি আন্দোলনের মাধ্যমে বর্তমান অবস্থায় সম্ভব সেটা যদি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবহৃত হয়– ইংরেজি, বাংলা, দর্শন, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান এমনকি পদার্থ-রসায়ন ইত্যাদি বিজ্ঞানশিক্ষার জন্যও ব্যয় করার সিদ্ধান্ত হয় তাহলে চিকিৎসা-কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি সীমিত আকারে হলেও যেভাবে দরকার তা সম্ভব নয়। চিকিৎসা-কলেজে ছাত্রভর্তি বন্ধ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধির কর্মসূচি এক না-হলেও এ দুই-ই যে একই সূত্রে গ্রথিত তাতে সন্দেহ নেই। উভয়ের শ্রেণিচরিত্র অভিন্ন।

শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য বিষয়ক আলোচনায় বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণের প্রশ্নটি সামনে আনার কারণ এদেশে বাস্তবত শিক্ষাবৈষম্য বলতে উচ্চশিক্ষার কাঠামোর মধ্যে নানাপ্রকার বৈষম্য এবং খুব জোর সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসাশিক্ষার মধ্যেকার বৈষম্যই বোঝা ও বোঝানো হয়ে থাকে। বৈষম্য দূর করার কর্মসূচি নির্ধারণে এবং আন্দোলনের সময় এভাবেই সমস্যাটিকে কার্যত উপস্থিত করা হয়। কিন্তু আমরা ইতিপূর্বেই বলেছি যে, শিক্ষাক্ষেত্রে, আসল বৈষম্য হল যারা এখন নানা পর্যায়ে শিক্ষা পাচ্ছে এবং যারা তার থেকে বঞ্চিত থাকছে তাদের মধ্যেকার বৈষম্য। যাঁরা বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনে একভাবে নিযুক্ত তাঁরা হিসাব দাখিল করে

দেখান ক্যাডেট কলেজ, মডেল ইস্কুল, সাধারণ কলেজ, সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদিতে মাথাপিছু ছাত্রদের পেছনে ব্যয়ের তারতম্য। এই তারতম্য সুবিধাভোগী শ্রেণিগুলোর মধ্যেকার পার্থক্য নির্দেশ করে। কিন্তু এই হিসাব উপস্থিত করার সময় যাদের শিক্ষার পেছনে এক পাইপয়সা খরচ করা হয় না তার কথা নেই! অথচ শিক্ষাক্ষেত্রে এর থেকে বড়ো বৈষম্য আর কিছুই হতে পারে না।

উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে আর দুই-একটি বিষয় উল্লেখ করে আমরা অন্য প্রসঙ্গে যাব। শিক্ষা নিয়ে যাঁরা আন্দোলন করেছেন তাঁদের একাংশের দাবি হল সর্বস্তরে শিক্ষার সকল ব্যয় সরকার বা রাষ্ট্রকে বহন করতে হবে। এটি খুবই উচ্চ চিন্তার ফল! কিন্তু দুঃখের বিষয় এই কর্মসূচি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ছাড়া অন্য ব্যবস্থায় সম্ভব নয় এবং আমাদের দেশের শাসনব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক নয়। কাজেই এটা এক গালভরা দাবি হলেও একেবারেই অর্থহীন ও অকার্যকর। আমাদের মতো অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশ তো বটেই, এমনকি অগ্রসর পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোতেও শিক্ষার সকল ব্যয় রাষ্ট্রীয়ভাবে বিশ্বের কোনো জায়গাতেই হয় না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এটা সম্ভব নয়। সে জন্য এই ধরনের দেশে বেসরকারি খাতেই মূলত শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে।

সর্বস্তরে শিক্ষার সকল ব্যয় রাষ্ট্রকে বহন করতে হবে এই দাবি তুলে কোনো কোনো রাজনৈতিক দল ও তাদের ছাত্র সংগঠন বাঙলাদেশে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে। এদের এই বিরোধিতা বাস্তবত তাদের উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণ কর্মসূচির সাথে একেবারেই সামঞ্জস্যহীন। কারণ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থা চালু হওয়ার মাধ্যমে এদেশে উচ্চশিক্ষার একটা সম্প্রসারণ নিশ্চয়ই হচ্ছে। সরকার বা রাষ্ট্রের দ্বারা যা সম্ভব হচ্ছে না সেটা এভাবেই বেসরকারি পর্যায়ে সম্ভব হচ্ছে। এইভাবে উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণের বিরোধিতার কোনো যৌক্তিকতা দেখাতে যাওয়া জেদের বশবর্তী হয়ে এঁড়ে তর্ক করারই শামিল।

এ প্রসঙ্গে এটা পরিষ্কারভাবে বোঝা দরকার যে, বাঙলাদেশে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বেসরকারিভাবে বিনিয়োগ হচ্ছে, বেসরকারি খাত সম্প্রসারণের একটা নীতি এখানে দেশীয় প্রয়োজন এবং সাম্রাজ্যবাদী চাপ উভয় কারণেই গৃহীত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী চাপ ছাড়াও একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হিসেবে, বাঙলাদেশে এর কোনো বিকল্প নেই। যে দেশে জমিজমা, কলকারখানা, ব্যবসাবাণিজ্য, যাতায়াত ব্যবস্থা থেকে নিয়ে সবকিছুর ব্যক্তিগত মালিকানা আছে, যে দেশে দীর্ঘকাল ধরে বেসরকারি খাতে স্কুল-কলেজের শিক্ষা প্রধানত আছে, সেখানে হঠাৎ করে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হওয়ার কোনো বোধগম্য কারণ নেই এজন্য যে বিশ্ববিদ্যালয় এমন কোনো 'পবিত্র' ক্ষেত্র নয় যেখানে বেসরকারি বিনিয়োগ হলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে। এদিক দিয়ে বিচার করলে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন একটা সম্পূর্ণ ভুয়া শিক্ষা আন্দোলন ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

আসলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্য বর্তমান পর্যায়ে অর্জন করতে হলে এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির পরিবর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রদের শিক্ষার মান উন্নয়নের দিকেই নজর দেওয়া দরকার। সম্প্রসারণের সাথে এর সম্পর্ক এই যে, এখন যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে অথবা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বের হচ্ছে, এমনকি ভালোভাবে পাশ করেও বের হচ্ছে, তারাও বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষা বলতে যা বোঝায় সেটা পাচ্ছে না। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরেই শিক্ষা সঙ্কুচিত অবস্থায় আছে। এই সঙ্কুচিত শিক্ষা সম্প্রসারণ করার জন্য প্রয়োজন শিক্ষকদের মান উন্নয়ন, শিক্ষা প্রদান ক্ষেত্রে ত্রুটিসমূহ দূর করা, লাইব্রেরি ও ল্যাবরেটরিতে পড়াশোনা ও গবেষণার সুযোগ সুবিধা প্রভূতভাবে বৃদ্ধি করা। কাজেই প্রকৃত অর্থে বাঙলাদেশে এখন উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির কোনোই প্রয়োজন নেই, তাতে বরং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সাথে শিক্ষার মান আরও নামিয়ে এনে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষাকে আরও গভীরভাবে সঙ্কুচিত করা হবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হল, বিদ্যমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্যই আরও অর্থ বরাদ্দ করা এবং শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচিতমতো শিক্ষা দান বাদ দিয়ে অতিরিক্ত অর্থ রোজগারের জন্য কনসালটেন্সিসহ যেসব কাজ করে থাকেন সে সব বন্ধ করা, তাঁদেরকে আরও দায়িত্বশীল হতে যথাসম্ভব বাধ্য করা, এক কথায় তাঁদের নিজেদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও শিক্ষা প্রদানের মান উন্নয়ন করার জন্য যা কিছু দরকার সেগুলো যথাসম্ভব করা।

উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণের চিন্তার দ্বারা উদ্দীপ্ত ব্যক্তি, দল ও ছাত্র সংগঠনের উপর শিক্ষা সম্প্রসারণ সম্পর্কিত দাবির একটি আবার হল, বিদ্যমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দুই শিফ্‌ট চালু করা! উচ্চশিক্ষার নামে এই ধরনের কথাবার্তা ও দাবি যে সম্ভব এই এক বিস্ময়কর ব্যাপার। কারণ এ কথা যাঁরা বলেন এবং এ রকম দাবি যাঁরা তোলেন তাঁদের কোনো যথার্থ ধারণা বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষা সম্পর্কে আছে বলে মনে হয় না।

বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষার অর্থ ক্লাসবক্তৃতা শোনা নয়, প্রাথমিক স্কুলের বা পাঠশালার মতো। ইউরোপ-আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ক্লাস বক্তৃতার গুরুত্ব তুলনায় অনেক কম। বেশি ক্লাসবক্তৃতা শুনতে যাওয়া অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের মতো বিশ্ববিদ্যালয়েও নিরুৎসাহিত করা হয়। তারা গুরুত্ব দেয় লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরির কাজ, টিউটোরিয়াল, শিক্ষকদের সাথে অনেক রকম ছোট আকারের আলোচনার ওপর। বাঙলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এমনসব ব্যবস্থা কোনোখানেই ঠিকমতো নেই। তার ওপর যদি দুই শিফ্‌ট চালু করা হয় তাহলে উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণের জায়গায় উচ্চশিক্ষা বলতে এখন যা কিছু আছে সেটাও ভেঙে পড়া। কাজেই উচ্চশিক্ষা-চিন্তার ক্ষেত্রে এর থেকে প্রতিক্রিয়াশীল ও ধ্বংসাত্মক চিন্তা আর কিছুই হতে পারে না।

এবার ফিরে আসা যেতে পারে শিক্ষাক্ষেত্রে আসল বৈষম্যের জায়গায়। কোটি কোটি গরিবদের জন্য শিক্ষার কথা উঠলেই বুর্জোয়া মহলে শুরু হয় তাদের নিরক্ষরতা

দূরীকরণের কথা। জিয়াউর রহমান গরিবদের নিরক্ষরতা দূর করার জন্য এমন কাতর ছিলেন যে, তিনি নির্দেশ জারি করেছিলেন প্রত্যেক স্কুলছাত্র অন্তত একজন গরিবকে স্বাক্ষর না করলে তাকে ক্লাসপরীক্ষায় পাশ করানো হবে না! সেই কর্মসূচি এতই ভুয়া এবং হাস্যকর ছিল যে, সে সময় স্কুলছাত্ররা প্রায়ই শিক্ষিত লোককে নিরক্ষর বলে চালিয়ে দিয়ে স্কুলে রিপোর্ট দাখিল করে উদ্ধার লাভ করত! মোটকথা, জিয়াউর রহমানের নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচির দ্বারা এদেশে গরিবদের স্বাক্ষরতা হয়নি, হওয়ার কথাও ছিল না।

বুর্জোয়াদের নিরক্ষরতা দূরীকরণের কর্মসূচির পুরো ব্যাপারটিই হল এক মস্ত ধাপ্পাবাজি। এর একটা বড়ো কারণ, তারা এর দ্বারা শুধুই বোঝায় একজনের স্বাক্ষর করার ক্ষমতা অথবা খুব জোর তাদের মোটামুটি অক্ষরপরিচয় হওয়া। অক্ষরপরিচয়ের বেশি কিছু শিক্ষা দেওয়ার মতো কোনো কর্মসূচি তাদের থাকে না, কারণ এতে তাদের অসুবিধে। এ নিয়ে তাদের কোনো চিন্তা নেই। অথচ অক্ষরপরিচয় থেকে শিক্ষার শুরু হলেও শুধু অক্ষরপরিচয় হওয়ার অর্থ শিক্ষালাভ নয়। আমাদের দেশে ব্রিটিশ আমল থেকেই অবশ্য গরিবদের, কৃষক-শ্রমিকদের, শিক্ষা বলতে শুধু এই নিরক্ষরতা দূরীকরণই বোঝানো হয়ে থাকে।

এ প্রসঙ্গে *রাশিয়ার* চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের কথা খুবই উল্লেখযোগ্য। রাশিয়ায় যেভাবে গরিবদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার শুরু হয়েছিল বিপ্লবের পর সে বিষয়ে তিনি বলেন, "আধুনিক ভারতবর্ষের আবহাওয়ায় আমি মানুষ, তাই এতকাল আমার মনে দৃঢ় ধারণা ছিল, প্রায় তেত্রিশ কোটি মূর্খকে বিদ্যাদান করা অসম্ভব বললেই হয়। এজন্য আমাদের মন্দ ভাগ্য ছাড়া আর কাউকে বুঝি দোষ দেওয়া চলে না। যখন শুনেছিলাম, এখানে চাষী ও কর্মীদের মধ্যে শিক্ষা হুহু করে এগিয়ে চলেছে আমি ভেবেছিলুম, সে শিক্ষা বুঝি সামান্য একটুখানি পড়া ও লেখা ও অঙ্ক কষা– কেবলমাত্র মাত্রা গুণতিতেই তার গৌরব। সেও কম কথা নয়। আমাদের দেশে তাই হলেই রাজাকে আশীর্বাদ করে বাড়ি চলে যেতুম। কিন্তু এখানে দেখলুম, বেশ পাকা রকমের শিক্ষা, মানুষ করে তোলবার উপযুক্ত, নোট মুখস্ত করে এম. এ. পাস করবার মতন নয়।"

সোভিয়েট রাশিয়ার গরিবদেরকে শিক্ষাদানের পদ্ধতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলছেন, "ওদের দৈনিক কর্মপদ্ধতি হচ্ছে এই রকম– সকাল সাতটার সময় ওরা বিছানা থেকে ওঠে। তার পর পনেরো মিনিট ব্যায়াম, প্রাতঃকৃত্য, প্রাতঃরাশ। আটটার সময় ক্লাস বসে। একটার সময় কিছুক্ষণের জন্য আহার ও বিশ্রাম। বেলা তিনটে পর্যন্ত ক্লাস চলে। শেখবার বিষয় হচ্ছে ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, প্রাথমিক প্রকৃতিবিজ্ঞান, প্রাথমিক রসায়ন, প্রাথমিক জীববিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্য, হাতের কাজ, ছুতোরের কাজ, বই বাঁধাই, হাল আমলের চাষের যন্ত্র ব্যবহার ইত্যাদি।"

শিক্ষা রাশিয়ার গরিবদের জীবনে কী পরিবর্তন এনেছিল সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "রাশিয়ার গিয়েছিলুম ওদের শিক্ষাবিধি দেখবার জন্যে। দেখে খুবই বিস্মিত

হয়েছি। যারা মূক ছিল তারা ভাষা পেয়েছে, যারা মূঢ় ছিল তাদের চিত্তের আবরণ উদঘাটিত, যারা অক্ষম ছিল তাদের আত্মশক্তি জাগরূক, যারা অবমাননার তলায় তলিয়ে ছিল তারা আজ সমাজের অন্ধকুটুরি থেকে বেরিয়ে এসে সবার সঙ্গে সমান আসন পাবার অধিকারী। এতে প্রভূত লোকের যে এত দ্রুত এমন ভাবান্তর ঘটতে পারে, তা কল্পনা করা কঠিন। এদের এককালের মরাগাঙে শিক্ষার প্লাবন রয়েছে দেখে মন পুলকিত হয়। দেশের একপ্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত সচেষ্ট সচেতন। এতের সামনে একটা নূতন আশার বীথিকা দিগন্ত পেরিয়ে অবারিত, সর্বত্র জীবনের বেগ পূর্ণমাত্রায়।"

প্রকৃত শিক্ষা এবং গরিবদের শিক্ষার কী চরিত্র তার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়ার জন্যই রবীন্দ্রনাথ থেকে ওপরের সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি তিনটি দিলাম। ঐ শিক্ষা যে সমাজতন্ত্র ছাড়া সম্ভব নয়, সেটাও এই উদ্ধৃতিগুলো থেকেই স্পষ্ট। আমাদের দেশের গরিবদের শিক্ষা যদি ওপরে রবীন্দ্রনাথ কথিত মাথাগুণতি শিক্ষার মতোও হওয়া সম্ভব হত তাহলে আমরাও বাঙলাদেশের বর্তমান শাসকশ্রেণিকে 'আশীর্বাদ' করে বাড়ি যেতাম! কিন্তু সেটুকু হওয়ার মতো অবস্থাও এখানে নেই। কিন্তু সেটা না থাকলেও সে চেষ্টা এবং তার চেয়েও বেশির জন্য চেষ্টা এই শাসনকাঠামোর মধ্যেও আমাদেরকে করতে হবে।

সরকারকে সর্বস্তরে সকলের শিক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে– এই দাবি যাঁরা করেন এবং একইসাথে উচ্চশিক্ষার বিস্তার হচ্ছে না বলে তার জন্য আন্দোলনের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেন তাঁদের নিশ্চয় জানা আছে যে, আমাদের দেশে ঢাকাসহ অন্য বিশ্ববিদ্যালয়েরগুলোতে ছাত্রেরা প্রায় বিনাপয়সাতেই পড়াশোনা করে এবং তাদের শিক্ষার বিশাল ব্যয়ভার রাষ্ট্রই বহন করে থাকে। আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এদিক দিয়ে যে সুবিধে পায় সেরকম কোনো সুবিধা নিম্নস্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রেরা পায় না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, এই সুবিধার ব্যবস্থা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য আরও সুবিধা আদায়ের আন্দোলন বামপন্থী দল ও ছাত্রসংগঠনগুলোও করে থাকে! তাদের এ-কথা মনে হয় না যে, দশ-পনেরো টাকা বেতন দিয়ে তারা যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স এম.এ. পড়ার সুযোগ পাচ্ছে সেখানে দেশের গরিব পরিবারের কোটি কোটি ছাত্র শিক্ষা থেকে একেবারেই বঞ্চিত রয়েছে অথবা সামান্য, নাম-কে-ওয়াস্তে, একটা শিক্ষা পাচ্ছে যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অক্ষর পরিচয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মুখে অবশ্য তারা কখনো কখনো এ নিয়ে কথা বলে, এবং কেউ কেউ নিজেদের কর্মসূচিতে এরকম পদ (item) ঢুকিয়ে রাখে, কিন্তু এ নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। এসবই হল আত্মন্তিকভাবে মধ্যশ্রেণি বা পেটি বুর্জোয়াসুলভ মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বার্থচেতনারই পরিচায়ক।

আগেই বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার গুণগত মান উন্নত করার ওপরই জোর দেওয়ার দরকার এখন সবথেকে বেশি। সে ক্ষেত্রে মূল সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সেগুলোর মোকাবেলার জন্য আন্দোলন করার দরকার। কিন্তু সে আন্দোলনের গুরুত্বের

উপলব্ধি কার্যত বিশেষ নেই। তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব মাসিক দশ টাকা বেতন, যা পাকিস্তান আমলের গোড়া থেকে তো বটেই, এমনকি ব্রিটিশ শাসনআমল থেকে অপরিবর্তিত আছে, সেটার কোনো রকম বৃদ্ধি প্রতিহত করার আন্দোলন!

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অল্পসংখ্যক গরিব পরিবারের ছাত্র পড়াশোনা করে এটা ঠিক। কিন্তু তারা এমন গরিব নয় যে, মাসে দশ টাকা বেতন কিছুটা বৃদ্ধি হলে তাদের বিশেষ কোনো ক্ষতি হবে অথবা মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৫ শতাংশ ছাত্রেরই দৈনিক হাতখরচ দশ টাকারও বেশি, অনেক দৈনিক দশ-বিশ টাকার সিগারেটই খেয়ে থাকে, যাতায়াত ও ঘোরাফেরা বাবদ খরচ করে আরও বেশি।

যাঁরা এদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করার জন্য সত্যিকার কোনো আন্দোলন করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ অথবা আগ্রহী তাঁদেরকে বৈষম্যের আসল চেহারাটার দিকে নজর দিতে হবে। একথা ব্যক্তি, ছাত্রসংগঠন, শিক্ষক সংগঠন, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। নজর দিতে হবে এ কারণেও যে, আমাদের দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের মধ্যে বড়ো রকম পরিবর্তন আনতে হলে বর্তমান পরিস্থিতিতে সাধারণ শিক্ষার বিস্তার অপরিহার্য।

এভাবে শিক্ষার বিস্তার ঘটাবার জন্য শিশু, বালক, কিশোর, বয়স্ক লোক সকলের জন্যই এমনভাবে ব্যবস্থা করা দরকার যা তাদের দৈনন্দিন জীবন ও কাজের সাথে সম্পর্কিত। কাজেই এ জন্য যে প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজনের প্রয়োজন সেটা কখনো একই প্রকার হতে পারে না। শিশু ও বালক, এমনকি কিশোরদের জন্য স্কুলের যে ব্যবস্থা এ উদ্দেশ্যে করা দরকার সে ব্যবস্থা মাঠে অথবা অন্যত্র সারাদিন খাটনিকরা লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। তার জন্য শুধু যে সময়ের হিসাবে সকাল-সন্ধ্যা করাই যথেষ্ট তাই নয়, শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যেও ভিন্নতা দরকার। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। সে আলোচনা পৃথকভাবে করতে হবে। এখানে শুধু এ বিষয়টির উল্লেখ করা হল এর গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে।

শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য বাঙলাদেশে এখন কী অবস্থায় আছে, অন্য দিক বাদ দিয়ে শুধু বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষাখাতে কত ব্যয় হয় তার হিসাব নিলেই বোঝা যাবে। আগেই বলা হয়েছে যে, এক্ষেত্রে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা খাতে মাথাপিছু যে ব্যয় হয় এবং কত সংখ্যকের জন্যে সে ব্যয় হয় এবং কত সংখ্যকের জন্য সারা দেশে কোনো ব্যয়ই শিক্ষাক্ষেত্রে হয় না তার হিসাব নিলে দেখা যাবে যে, গরিব পরিবারের কোটি কোটি ছাত্রের জন্য এই পাইপয়সাও ব্যয় হয় না।

এই দিকটির প্রতি দৃষ্টি না-দিলে বৈষম্য দূরীকরণের প্রকৃত কোনো আন্দোলন সম্ভব নয়। কাজেই এক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি এবং সেই সাথে বিভিন্ন বয়সের গরিবদের জন্য পৃথক প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন– এ দুইয়ের ওপরই জোর দিতে হবে।

অপর যে বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে তা হল প্রাথমিক পর্যায়ের এই শিক্ষার জন্য উপযুক্ত পাঠক্রম। অক্ষরপরিচয় এবং অঙ্কের সাথে এমন অল্পকিছু বিষয় এই পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যা তাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে সম্পর্কিত। কারণ এই ধরনের পাঠক্রমের ওপর অনেকখানি নির্ভর করবে অল্পবয়স্ক অথবা বয়স্ক ছাত্রেরা তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে টিকে থাকবে কিনা।

শ্রেণিস্বার্থ একজনের মধ্যে কিভাবে কাজ করে এটা অনেক সদিচ্ছাসম্পন্ন মানুষের পক্ষেও বোঝা সবসময় তেমন সহজ নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য নিয়ে বর্তমানে যে সামান্য কথাবার্তা বা আন্দোলন হচ্ছে তার দিকে তাকালেই এটা বেশ স্পষ্ট হয়। বৈষম্য, মানবিক অধিকার ইত্যাদি নিয়ে অনেকরকম কথাবার্তা শোনা যায়। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব নিয়ে চিন্তা একটা শ্রেণিকাঠামোর মধ্যেই হচ্ছে। অর্থাৎ নিজেদের শ্রেণির বাইরে বৈষম্য ও মানবিক অধিকার নিয়ে এসব ক্ষেত্রে কোনো চিন্তাভাবনা নেই। তারা নিজেদের শ্রেণিকাঠামোর মধ্যেই এসব সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত।

চিন্তাগতভাবে এই শ্রেণিকাঠামো ভেঙে না ফেলে অর্থাৎ একে উত্তীর্ণ না-হয়ে বৈষম্য-সমস্যা বিবেচনা করলে সমাজে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রকৃত বৈষম্য দূরীকরণের এমন কোনো আন্দোলনই গড়ে তোলা সম্ভব নয় যাকে সত্য অর্থে বিপ্লবী তো নয়ই, এমনকি গণতান্ত্রিক আন্দোলন হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

উৎস: সংস্কৃতি, ডিসেম্বর ১৯৯৯

কবিতা

# আ শি র  দ শ ক

শা ন্ত নু  চৌ ধু রী

## বাঘবন্দি

পায়ে পায়ে পায়ের ভেতর
মাথা রেখে যদি আরও বসে থাকা যেত
কোনোভাবে, কোনো একভাবে, কোনো খড়ের গুহায়,
মেরুতম বাঁধের ফাটলে যদি বসে থাকা যেত,
মাদক লতার গর্ভে জন্মে কিংবা বনবাদাড়ের
সবুজ বিভ্রমে, আহা, আলতো ছোঁয়ায় যদি কেউ
দাদু ভেবে আমাকে জাগায়–দাদু নাকি!

অগত্যা জেগেই থাকি ;
অনেক গভীর হয়ে বসে থেকে, বসে থেকে থেকে
অগত্যা নিজের সঙ্গে নিজে আমি বাঘবন্দি খেলি,
বাজি রাখি, তাঁবুর বাইরে তাকে নিয়ে যেতে চাই ।

তারপরও বসা হয়
বসে থেকে কিংবা তর্কের বাইরে থেকে
চারপাশে শেষ হয় গান–গড়াগড়ি ;
বসে থেকে বা বসে-ছড়িয়ে-থেকে ভাবি
ছোটো বড়ো ধূলিঝড় আর যত খালের বিপদ
ঘুমে পার হওয়া গেল অথবা গেল না
আর গেল ব'লে এখনো বাঘের ভয়,
কোথাও ক্ষরণ হয় খুব
এখনো আমার নিরাপদ বসে থেকে ।

## মুঠোবন্দি

ঘনিষ্ঠ চাপের মুখে মুঠো খুলে সমুখে দেখাও
মুঠো হলে কতটা আনগ্ন হয় হাত আর লাল
কেমন ব্যাপক হয় রঙ,
কেন জাগে চোরা গরম গুহানুভূতি, মুঠো হলে ।

নিয়মিত নগ্ন করমর্দনের মাঝে
যে-হাত হারিয়ে ফেলে বোধ,
যে-হাত পরখ হয় হাতে অথবা কব্জির চাপে
অগোচরে ভেঙে যায় আঙুলের শীতসর্বস্বতা
অথবা মোচড় খেয়ে কাঁপে, কড়া নাড়ে,
করিডোরে লাশ আগলায়

সেই হাত মুঠো করে দেখো, চুড়ো করো, চুমু খাও ;
ঘনিষ্ঠ চাপের মুখে অকাতরে খুলে দাও মুঠোর পাহাড় ।

## ছকবন্দি

সমস্ত চিন্তার জালে যদি একে একে
সম্পূর্ণ আটকে যাও তোমরা সকলে,
রাতে দরজায় সামান্য টোকার শব্দে
যখন তোমরা বিচলিত,
কিছুই করার নেই তখন আমার;
আজকাল কোনো কিছু থেকেই বেরোতে
পারছি না, হে করুণাসিন্ধু, আমি আর,
বেরোতে পারি না আমি দিনানুদিনের
চর্বিতচর্বণ থেকে, শতছিদ্র আর ছক থেকে,
প্রত্যহ প্রাতঃভ্রমণ থেকে,

সন্তান-সন্ততি আর পিছুটান থেকে,
এমনকি নিজের ভেতর থেকেও না;
কী অদ্ভুত! যেন সব কৌতূহল মরে
গেছে আজ আমার ভেতরে;
যেন শুধু ভাত-রুটি খেয়েই বাঁচতে
চাই আমি ব্যাঙের ছাতার নিচে সামান্য জীবন;
যেন-বা বিহঙ্গদৃষ্টি দিয়ে আমার নিজের সঙ্গে
বলতে চাইছি আমি সব কথা সকল সময়;
কিছুটা সময় আমি নির্বিবাদে কেবল নিজের
মধ্যে বসে থাকতে চাইছি আজকাল;
চাইছি মৌরিফুলের মতো
কারও গন্ধে বুঁদ হয়ে যেতে;
শুধু একবার বেতসলতার মতো
কাউকে জড়িয়ে ধরে আজ
চাইছি সম্পূর্ণ তছনছ হয়ে যেতে.....

## উনুনসূত্র

মনে হয়, আবার সর্বস্ব নিয়ে, হে গূঢ় আকাঙ্ক্ষা,
ধুলোমেলো তেজের সামনে গিয়ে বসি ;
উনুনের অরব, অপরিমেয় গন্ধের সামনে ।

চারদিকে এত বাষ্প, হলুদ খোয়ারি, এত এত খাদ্যকণা,
চারদিকে বৃষ্টি আর বৃষ্টি আর ছাতার অরণ্যে
যুগপৎ এমন কালাতিপাত করে
লাবণ্য ফুরিয়ে আসে ;
পৃথিবীর টন টন পাতার কঙ্কাল পুড়িয়ে পুড়িয়ে
যতদূর আলো হলো পুড়িয়ে পুড়িয়ে
যতদূর জানা গেল লতার বিস্তার, ডোডোপাখি,
প্রতিদিন চিন্তার আগ্নেয় ব্যবহার –

তা সবে আঁতকে উঠি,
মনে হয়, গ্রহ-গ্রহাণুর নিভে আসা
আমিও দেখতে পাই সঙ্গিনীর চোখে ;
মনে হয়, আমিও সমান অন্ধ, ধুলোমেলো, ধরো, নিমখুন ;
নৈঃশব্দে পৌঁছার আগে বুঝি আমাদের কথাচ্ছলে
উনুনের টকটকে আঁচ নিভে আসে!

## টানাপড়েন

আমার অনেক মুশকিল
বিচ্ছেদের অমোঘ আশঙ্কা নিয়ে বুড়ো হয়ে
এখনো কুঁকড়ে থাকি, সই;
এখনো আমার চারদিকে
হলুদ পাতার মতো রূপ;
বহুদূর ছড়িয়ে রয়েছে অসূর্যস্পর্শার লাশ;
বহুদূর নীরবতা অশোক-পলাশ ।

জগতের তাবৎ কলকব্জার মাঝে
প্রতিদিন শত দুরভিসন্ধির মাঝে
বসে থেকে ভাবি, আমি তেমন স্বয়ংচালিত কই!
আমি আজও একেবারে বুকের ভেতর
থেকে খোলাখুলি কথা বলি;
অভ্যেসবশত ঘরে আজও কাটাই অরণ্যদিন;
বছরের কিছুটা সময় বইয়ের অনেক তলে
গিয়ে দেখি বইয়ের অধিক বই–পাতার সন্ত্রাস;
অথবা দেখতে পাই উনুনসমাজ,
কাঁধে বোঝা, ডাকঝুলি, ঘরে ঘরে পাঠকমানুষ;

তবু সুসংবাদ কই?
ডাকবাক্স কই আজ?
ভেতরে ভেতরে শুধু আমাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে

কেবল টানাপড়েন আছে;
তদুপরি বহাল রয়েছে আজও ফায়ারিং স্কোয়াড ।

## দারিদ্র্যরেখা

কোথায় দাঁড়াবো তবে আমরা এখন!
যেদিকে তাকাই সবখানে
আমাদের সীমারেখা আছে,
সীমাহীন চরম দারিদ্র্যরেখা আছে ;
সবখানে গুটিসুটি আজ অপেক্ষা করছে ছায়া,
সবখানে ভয়ে ভয়ে আরও দূরে সরে
যাবার কথাই আজ পাখিরা ভাবছে ;

অনেকে ভাতের জন্য ঘুরে ঘুরে এখন ভাতের
মতো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে ; অনেকে মরচে
ধরে হয়ে আছে অযান্ত্রিক শব–কান্নাও বাড়ছে ;

বাড়ছে হালকা থেকে ক্রমে আরও হালকা লোকের
মনের উৎসব–রক্তারক্তি ;
বাড়ছে রঙের অসভ্যতা, লম্ফঝম্ফ, নীল দড়াদড়ি ;
তবু বর্ণ-গভীরতা বাড়ে না কোথাও ;

রঙের অসুখে ভুগে, দেখো, তবু ওদের ঈশ্বর
আছে বেঁচে আর ওই ভয়ঙ্কর কাগজের বাঘ
সারাক্ষণ বাতাসে উড়ছে ;
সারাক্ষণ বাতাসে নামছে ;

কোথায় দাঁড়াবো তবে আমরা এখন!

*উৎস: উনুনসূত্র গ্রন্থ*

# চশমাহিল

চশমাহিলের দিকে যাব ।

সম্ভবত কোনও চশমাহিলের দিকে
তবে চলে যেতে হবে এখন আমাকে ।

চশমাহিলের দিকে তবে যেতে হলে
কম্পাস, সরলরেখা কিংবা রোদছাতা
কারও সঙ্গে আমি আর নেই ;
কারও মধ্যে থাকতে চাই না আমি আর
অমন তৃতীয় মাত্রা নিয়ে ট্রেন ছাড়ার সময় ।

তারপরও চশমাহিলের দিকে গেলে
সম্ভবত কিছু-বা আভাস পাওয়া যাবে ;
অন্তত আবারও দেখা পাওয়া যেতে পারে তাহাদের ;
যদিও হে বিপন্ন ডাকবাক্স, ওদের কাউকে
আমি ঠিক চিনে নিতে পারবো না আজ ;
অথবা চিনতে পারবো না আর জেনে
চশমাহিলের দিকে প্রতিদিন আমিও চলেছি ।

আসলে চলেছি না কি আর!
ভাবা যেতে পারে কোথাও চশমাহিল বরাবর
আমিও চলেছি : কিন্তু কোথায়? আসলে কত দূর?
কিংবা ভাবা যেতে পারে আসলে চশমাহিল বলে
কিছু নেই, সবই ঘুম আর শুধু ঘুমের পাহাড় ।

তথাপি চলেছি আমরাও,
দড়ির ওপর দিয়ে, ধরো, মর্মের ওপর দিয়ে,
কিছুকাল নিজের ভেতর, কিছুটা শূন্যের নাক বরাবর ।

## অনুচিন্তার ঘোর

সমস্ত চিন্তার ভারে আমিও কি হয়েছি জখম!
নইলে চিন্তার ঘোলা জলে এভাবে হারিয়ে যাব
কেন! কেন ওই গুহাগুহানুভূতির তল থেকে উদ্ধারের
পাঠাবো সঙ্কেত তোমাদের, কিংবা পাতাবাহারের
স্বর্গে কেন আমি ভেতরের কেউ নই কিংবা নই
বাইরের অভিজাত কেউ! কেন রক্তচিহ্ন ঘষে ঘষে তুলে
ফেলতে পারি না দেয়ালের, নদীমাতৃক পাঠকসমাজের

তবু চিন্তাসমুদ্রের ঘূর্ণি ভালোবেসে আমি ধ্বংস
হতে যাই, শেওলার সবুজ সরল গন্ধ লেগে থাকে পিঠে,
কিংবা সারাদিন কই কই ঘুরে বেড়িয়ে চিন্তায় শেষে আমি
মগ্ন হয়ে পড়ি, যেন সব শেষে চিন্তামগ্নতায় ঘটে যায়
আমার করুণ রূপান্তর, আমি নিভু নিভু তারাদের কথা
ভাবি কিংবা অতলে চিন্তার স্রোতে ভেসে চলি কোথাকার
কোন কাঠবাদামের সম্পূর্ণ হলুদ পাতাটির মতো হেসে

যেন সব চিন্তা হারিয়েছি আমি, সব চিন্তা ভুলেভালে ভরা,
চিন্তার অপরিণত বিন্দু দিয়ে চেতনার দু'কূল ভাসাই;
আর শুয়ে থাকি চিন্তার নৈরাজ্যে, ডুবে থাকি চিন্তার বাইরে,
কিংবা বাইরেও নয়, ভেতরেও নয়, শুধু যাতায়াত করি
চিন্তার আলোকে, লেজে, মাথায়, চিন্তার জটাজুটে

## সেলাইতামাশা

রক্তজার্সি পেয়ে গেলে সকলের সমান বিপদ;
আমরা নিঃসঙ্গক্রমে আসলে ভেতর থেকে মরে গেছি যারা,
আমরা বংশানুক্রমে যারা নতজানু, বহু রাত

হাজতে করেছি বসবাস, আমরা অস্পষ্ট যারা
শাদামাটা কাগজের বাঘ, শাদা হয়ে পড়ে থাকি,
শুধু শাদাসর্বস্ব ব্লিচিং পাউডার, ভোরের চেয়েও শাদা,
আমরা সুস্থতা হারালাম পৃথিবীর কোন বয়ঃসন্ধিক্ষণে!

কীসের ভেতরে যেন বাঁচি! কী যে থেকে কী যে হয়,
কেন ভাবি রেখাটা সরল নয়, কেন ঘটে এত সামাজিক
হারিকিরি, সমস্ত রক্তের ফোঁটা নীল হয়ে, কিংবা রাতারাতি
ফুল হয়ে ভোরে আজও অমন অপরাজিতা হয়, কেন ভাবি!

যতক্ষণ হাঁটার ক্ষমতা আছে, হাঁটবার শাদাছড়ি আছে,
যতক্ষণ চরম দারিদ্র্যরেখা বরাবর বিপদের চাকাটা যেতেছে,
তার দিকে কত দূর নেমে যেতে পারি, কত দূর!

তার চেয়ে উল্টো দিকে মুখ করে একবার কোথাও দাঁড়াবো,
ওইখানে, যেখানে দাঁড়াতে নেই, যেখানে সংখ্যায় বৃহন্নলা
বেশি, কিংবা দর্জিমুখ বেশি, রাতভর রক্তজার্সি সবাই সেলাই করে!

## পিলো-ওয়ার

বালিশ খেলার মধ্য দিয়ে

বাস্তবিক বালিশ খেলার মধ্য দিয়ে
রদবদলের মজা টের পাচ্ছে অফিসবন্ধুরা

বাস্তবিক বীজ ফেটে শিমুল তুলোর মতো উড়ে
সবার ক্ষমতালিপ্সা চমৎকার ছড়িয়ে পড়ছে
পরিপাশে : খেলাচ্ছলে মস্তিষ্কের কোষে ;
প্রত্যেকের হাতে হাত অকুস্থলে চলে যাচ্ছে ঠিকই
তৃণমূল ক্ষমতার বহু ব্যবহৃত শাদা সিল্কের বালিশ

বালিশ খেলার মধ্য দিয়ে

অন্তত আড়ালে যত গুরুতর ধারণাবদল হচ্ছে রোজ,
ঘুরে-ফিরে কেউ একজন সব উপধারণার
আরও এক ধাপ ওপরে উঠছে, কিংবা দড়ি বেয়ে
ক্রমাগত পৃথিবীর তলায় নামছে কেউ, নয় কেউ কেউ
হাতবদলের মজায় বিপন্ন, বোকা, হেসে পুরোপুরি খুন ;
কেউ-বা ভাবছে এসব দারুণ খেলা বালিশের,
একদিন এই খেলা ক্ষমতানুগমনের মই

বালিশ খেলার মধ্য দিয়ে

## ইন্টারোগেশন সেল

আমাকে এখনই ডাকা হবে কিন্তু কোথায় তলব
করা হবে, তার বলা হয় নি কিছুই, জেনেছি সবার আগে
আমাকেই ডাকা হবে, কিন্তু কেনই-বা ডাকা হবে
তা জানায় নি ওরা, ওরা মানে কপট পাঠক,
ওরা টিকটিকি, হাওয়া, ওরা সব অবলোকিতেশ্বরের বাবা,

ওরা জানে আমার বাগান আছে, লাল বইয়ের পাহাড় আছে,
তবু খুলি নাই শখের দোকান, পানশালা, অর্ধেক জানালা,
কেবল সন্ধের পর দাবা খেলি, তাতে কিস্তি বাজিমাৎ, তাতে
সব অর্থ মাটি হয়ে যায়, আর খেপে যায় অন্ধ বাড়িঅলি,
কথার ভেতরে তার বাঁকানো চুম্বক, রক্তে আনে ঠাণ্ডা অনুভূতি,

শুনেছি ওরা কী সব জানতে চাইছে আর প্রশ্ন-প্রমাণের
সামনে জবান পাল্টে যাচ্ছে ছায়াবন্ধুদের, কবিদের;
ওরা সব সংখ্যাকে বলছে সাধু, শব্দকে আওয়াজ,
সব চিঠি আর চিরকুট করছে সন্দেহ, চিন্তাকে আঘাত;
ওরা নাম ধরে ডাকছে অথচ নামে নয়, অদ্ভুত সম্ভ্রমে

## শিশুভাষ্য

যাদের জানার কথা তারা সব দেবদারুগত
যাদের বোঝার কথা তারা রাঙচিতা, তারা চুপে
তালা খোলে ভাষাশহরের : মনের শহরে তবু
এখনও আটকে থাকে ওরা বিদেশি ভাষার মতো ।

কারা ছিল ডানপিটে? জলমাকড়সা? কিংবা কিলবিল পোকা
ছিল কারা? কাদের ঔরসে কবে জন্মেছিলে গেরস্থের খোকা?
অথচ মা ছিল আদিবাসী, বাবা ভোরের দোয়েল,
মমতার পালক হারিয়ে কেন কেঁদেছিলে পথে!

আজন্ম চিন্তার মাঝে বেড়ে ওঠা ক্ষুধার চিন্তায়
তবু অতিপ্রাতিস্বিক কার চাবি খোঁজো আর ফেরো,
ভাবনার পুরনো ছিটমহল, যাদু, কেন যে ফেরত চাও
বন্ধুদের কাছে! কেনই-বা বুঝতে চাও কার চাবি

কার হাতে ঘোরে, গোপনে ছড়িয়ে রাখে কারা এত অধিজাল!
তবু ফের গর্ভ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো খোকা হামাগুড়ি দিয়ে;
যাদের জানার কথা তারা সব বহু আগে দেবদারুগত,
যাদের বোঝার কথা তারা রাঙচিতা, সাবানের বুদবুদ!

## বর্ণচোরা

বর্ণ কই! সে তো ছিল একটু আগেও, গেল কই!
অনেক অনেক দূরে কোথাও মিলিয়ে গেছে, বর্ণ!
খাঁটি সম্ভাবনা যেভাবে লুকিয়ে থাকে শক্ত ধাতুর ভেতর,
তারও চেয়ে জ্বলজ্বল, ভারী, স্বভাবে নির্ভার এই বর্ণলোক ।

বর্ণ যেন ধুলোমেলো রেখা, খুব কাছের অসীম,
কোথাও আটকে থাকে ভুলে, কই-কই চলে যায়,
ফিরে আসে শেষ রাতে আর যত রান্নাবান্না সারে;
আগুন ছাড়াই রাঁধে ভাত, ভাবে সেদ্ধ তার তরিতরকারি ।

বর্ণ নেই! একই গল্পে বর্ণ কাটায় না বেশিদিন,
বর্ণ শুধু অসবর্ণ মর্ম ফেরি করে, সবার গোচরে থেকে,
থাকে অগোচরে, সবার হাঁচির নিচে ক্রমে চাপা পড়ে যায়,
নিজে তবু কখনও হাঁচে না, নিজে থেকে কখনও না ।

বর্ণ কোথা! বর্ণ কই! শ্যাম বর্ণে দেখি তবু তারে,
বর্ণের বিহনে, আহা, এই দেহবর্ণ ঘন শ্যাম হয়ে যায়,
শ্যামের চেয়েও শ্যাম কিংবা রাধার চেয়েও রাধা ;
বর্ণের বদলে কে-বা রাধা, ওরে, কে-বা শ্যামরাই!

*উৎস: হাঁটো, হাঁটাবাবা গ্রন্থ*

## শা ম সে ত  তা ব রে জী

## এ্যানথোলজিয়া সিরাজগঞ্জ

১

জানি তো আমার জন্য বসে থাকবা না ।

আত্কা লাফিয়ে ঝলমলে রিকসায় উঠে
১নং খলিফাপট্টি পার হয়ে ঢুকে যাবে
২নং খলিফাপট্টির চিপায় । আমরা খুঁজেই যাব তবু:
টগর শফিকে নিয়ে যাবে লক্ষ্মী সিনেমা হলে,
মতিডাক্তারের ভদ্র পোলার সাথে সিনিয়র ময়েজ
ভুলে গিয়ে তোমাকে খুঁজবে এলিয়ট ব্রিজের নিচে
লাট্টুর দোকানে আর আলতাফ কালীবাড়ি

ডিমের আড়তে গিয়ে রোঁয়া-ফোলা টিকটিকির লগে
শুয়ে পড়বে অজস্র কুসুমের ঘোরে। এদিকে সামাদ
একডালা থেকে ফুয়াদের গলা ধরে ফিরতে ফিরতে
শুনে নেবে কী করে সে ভূগোল আপাকে ফুসলিয়ে
খালের পশ্চিমে ঘন কলাবাগানের ঝোপে
নিয়ে গিয়েছিল মর্নিংস্কুলের শেষে, ১৯৭১-এ...

২

আমরা বাহিরগোলায় উঠে মেন স্টেশনে নামি
নামতে গিয়ে তাড়াহুড়া কারে ফেলে যাই,
ও তার নাম জানি না যারে ফেলে যাই
আঙুল গুণে দেখি আমরা নাম ছাড়া কেউ নাই
কিন্তু কারে ফেলে আসি নামের চেয়েও দামি
ইস্টিশানে হাজার মানুষ, তারাও খুঁজে কারে
খোঁজাখুঁজির শেষ নাইরে গিরিম্মে বা জাড়ে
আমরা ডানদিকে চাই, তাকাই বাঁয়ের ধারে
হারুপাট্টি একেকজনা ঘামে ফর্দাফাই
বাহিরগোলায় ফিরে এসেও কেউরে নাহি পাই
হারান শালা, উধাও হল নামেরই বাহারে...

৩

ঘুরে ঘুরে আমি বার বার জেলগেটে চলে আসি।

চোরের মতন লাগে নিজেকে আমার, চোরাগোপ্তা পথে বাহিরগোলা পাড় হয়ে মারওয়ারি পট্টির অষ্টাদশ শতকের পোড়ো বাড়িটার মুখে এসে আবার জিজ্ঞাসা করি, আল্লার কীরা সত্যিসত্যি ক, কিছুমিছু চুরি তো করস নাই? বান্দির বাচ্চা তবু রা করে না! ওই শালা, শুক্রবার সন্ধ্যা যখন হয়-হয়, চুম্বুলি আপার বাংলাঘরের সামনে দিয়া এক লৌড়ে কেন ঢুকে গেলি পইগোরে বাড়ি, আর অর ভেজা জানালার কপাট তো চিরকাল খোলা! ক, শালা, কোন্ জন্মের ফেরে পড়ে তুই যাস জলির সর্দি-লাগা রবীন্দ্র বিতানে? একদিন তোরে দেখা গেছে হৈমবালা স্কুলের পিছে দুই হাতে মাথা চেপে

রয়েছিস বসে? তা ছাড়া পুলিশের পোলা বাদশা বাড়ি থেকে তৃতীয় বারের মতো উধাও হয়ে পুনরায় ফিরে এসে গাপ ছাড়ে, তুই নাকি সালমার দেওয়া কাগজের ফুল ঠেসে ধরছিলি অর নাকে? আর সঙ্গে-সঙ্গে এক নিরুদ্দিশ লঞ্চ এসে অরে তুলে নিয়ে যায়, স্বপ্নের ভিতর দিয়া ধোঁয়া ছেড়ে ছেড়ে সেই লঞ্চ অরে নামায়ে দিছিল চারাবাড়ি?

এখনও সময় আছে, সত্যি কথা ক, তা নইলে ওই যে দেখতে আছস বত্রিশ শিকের জানালা, পুটকিতে এক লাথি মেরে হান্দাইয়া দিমু ওই ঘরে। শালা, তুই ভুলেই গেছস যুদ্ধ যখন লাগে-লাগে একরাতে শহরের যত যত বিহারি আছিল, পেট্রোল ঢেলে এক লগে আগুন জ্বালিয়েছিল, মনে নাই তর?

সে গল্পও কিন্তু যুদ্ধেরই, ১৯৭১ সালে!

৪

এত রাতে কনে যাস বাপ,

*একডালা একডালা*

বাড়ি কনে বেটা তয় তর?

*একডালা একডালা*

যাওন-আহন একই নাম?

*একডালা একডালা*

শাখা-প্রতিশাখা তবে? তাও,

*একডালা একডালা*

৫

ওই মাঠ মনে পড়ে, ক্রিকেটের মাঠ
বিরাট্, বিরাট্

খুশিমামুদের পামবীথি মনে পড়ে, গম্ভীর পাম
এহন কুথায় পা'ম!

টগরের কথা মনে পড়ে, সিনেমা-টগর
মেয়েদের মতো যার স্বর!

'এসডু' সাবের বাড়ি মনে পড়ে, এসডু-র বাড়ি
যমুনা-তলার সহচরী ।

মনে পড়ে রতনের সাইকেল, আহা, সাইকেল-রতন
ঠিক যেন আমি-নার মতন

পোস্টাফিস মনে পড়ে এলিয়ট ব্রিজের ওপর
ডাকবাক্স লাল অতীব প্রখর!

৬

নানির বাড়ি ছিল খোরাসানে
চশমা হজু করত পথের ধারে,
সময় নাই মুস্কিল ও আসানে
নিজের তরে, আথারে-পাথারে
খুঁজত লেন্স নিকট এবং দূরের,
কবের কথা গিয়েছে তেহরান–
মনেও নাই, বরফ অশ্বক্ষুরে
আগুন হয়ে ছিটকে ছিল জান,
রক্ষা পেয়েছিল কোনোমতে ।

ব্রিজের গোড়ায় চট বিছিয়ে নানি
দূরকে কাছে করার মৌন ব্রতে,
নিজের চোখেই পড়ল মরার ছানি

বদনসিবে, বদহাওয়াতে তার
চশমা ভেঙে হলই মিসমার!

৭

আমরা ফায়ার ব্রিগেড ক্রস করি
আমরা লুকিয়ে যাই ধানবান্দিতে,
দানাপিনা পড়ে নাইক্কা দুপুরে
সূর্য নামছে গ'লে দশ চান্দিতে ।

যমুনা তো দ্যাখে না মোদের
আমরা যমুনা দেখে একলগে ফিরি,
আরশ মুল্লুকে উঠে গেছে
জলের তলার থেকে ফোটনের সিঁড়ি ।

আমরা রহমতগঞ্জে ছুটে যাই
অলাবু-সন্ধান যদি মেলে!
সারা গায়ে মাখি রোশনাই
জলিগোরে ছোট্ট বিকেলে!

৮

গলাগলি ধরে হেঁটে গেছি লঞ্চঘাট,
এ ওর পকেটে রেখেছি নিঃস্ব হাত,
এর চুল লেগে ওর চুলে বিভ্রাট
পয়দা হয়েছে অচেনা খুঁটিতে তাঁত ।

*বল্, বিশ্বাস কে করে এখন বেটাছেলে ছিলি তুই!*

খালেকের গরু খেয়ে গেছে ফুলগাছ,
আমার উঠানে যেখানে বৃষ্টি-নাচ
দেখেছি দু'জন, শুনে গেছি এস্ত্রাজ-
দূরে চলে গেছে আমাদের ছোট 'কাছ' ।

*বল্, বিশ্বাস কে করে এখন বেটাছেলে ছিলি তুই!*

যমুনার পাড় ধ'সে গেছে চুপচাপ-
কাদা লেগে গেছে, তরবারিছাড়া খাপ
দ্বিধায় করেছে নীরবে মনস্তাপ,
যমুনা উগারি উঠেছে গরম ভাপ ।

*বল্, বিশ্বাস কে করে এখন বেটাছেলে ছিলি তুই!*

৯
কার গন্ধ ফিরে ফিরে আসে,
পুনরায় গঠে নিরাকার,
নিদ-নম্র জাগিছে বালিশে

কার গন্ধ, কার?

১০
গরম গুড়ের ঝোল ঢেলে-ঢেলে বাসন্তির বাপ,
আমাগোরে কার্তিক কাকা
ভরে ফেলছেন শীতলপাটির পিঠ
গুলে যাওয়া চান্দের মতন ঘোলা
এক একটা বাতাসা জানি বাসন্তির চোখ
নিঃশব্দ, নির্বাক হ্যারা
চেয়ে থাকে কড়িকাঠ পানে

আর সীমান্তে সীমান্তে অপেক্ষায় কোমর বাঁধেন
লাল পিঁপড়া সাদা পিঁপড়ার সৈন্যবাহিনী

আচমকা আমার জিভে
বঙ্গোপসাগরের নোনা জল উছ্‌লায়া ঝরে

বাসন্তির বাপ, ও কাহা-র বাচ্চা কাহা
তুমি একবারও দেখলা না চাইয়া
এই পুত কারে বিনা মরে!

১১

ঝড়ো-হাওয়া নিছে উড়িয়ে সকল তুষ,
তুই আর তুই নাই রে মানিকচাঁন ।
কে রুখবে তোরে, ফুঁসে ওঠে অঙ্কুশ,
গড়ায় ধুলায় কলঙ্কী শামাদান ।

সে দিন বুঝিবা ছিল শুক্কুরবার,
বড় পুল ঘেঁষে উড়ে যায় ধলা বক ।
কাঁপছে কামান, থরোথরো আন্ধার,
ওরে ও মানিক, বাহিরায় তোর ধক

এই দেহে আজও, তিরিশ বছর পর
মাঝে-মধ্যেই কেন আসে ঘোর জ্বর!

১২

একটু লম্বাটে, খানিক ফর্সা,
চোখের ভিত্‌রে আকুল বর্ষা,

*ডাইনিই নাকি এসেছিলি তুই পই!*

মোহিনী জর্দার উতলা গন্ধ,
এলানো চুলে খেলে বাতাস মন্দ,

*ডাইনিই নাকি এসেছিলি তুই পই!*

আমার চোখে শুধু ব্যাঁকানো অক্ষর,
স্বপ্ন স্বপ্ন ভাবের মক্কর,

*ডাইনিই নাকি এসেছিলি তুই পই!*

নরক গুলজারে অখিল গর্ত,
নগদপ্রাপ্তির এটাই শর্ত,

*ডাইনিই নাকি এসেছিলি তুই পই!*

মরণকামনা বাক্যে উক্ত
আর কোন্ পথে ক্যাম্‌নে ঢুকত

জিরাফের গলা যেথা আমি মরবই?

*ডাইনিই নাকি তুই-ই এসেছিলি পই!*

১৩

কেমনে জানিবি তুঞি,
এই শোয়াশুয়ি
চাঁদ লেগে হয়েছে পুরাণ,
বেড়ে গেছে আরও ব্যবধান,
প'ড়ে আছে বালিশের অড়
একাকীই নিভেছে দিওড় ।
কেমনে সহিবি দর্দ-দিল,
বিষাক্ত তিল,
ব'য়ে নামা কষ

উপচে পড়ে মাটির কলস ।
বিকরাল অনন্ত অমা
শুদ্ধ করে জমা
কয়েকটি খড়,

নামমাত্রে তারাই অমর!

১৪

নীল একটা চাঁদ স্ক্রল ক'রে ক'রে আসে দ্বিধা-আর্ত যোদ্ধার মতো
ঘন ঘন শ্বাস পড়ে তার, বেপথু একটা সাপ মুহূর্তমাত্র দেখে চ'লে যায়
গভীর জঙ্গলে । আর কতদূর গেলে শত্রুর ঘাঁটি খুঁজে পাবে চাঁদ?
কোমরে গ্রেনেড গর্জায় ফেটে পড়বার অসহ্য আবেগে, কে ঝাঁকায়
সহসা তারে হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ধ'রে? নাকি বুঝতেই পারেনি কখন আহত
হয়েছে শত্রুর গুলিতে, উড়ে গেছে পা! এক্ষুণি ধ'সে যাবে প্রশস্ত কাঁধ,
তারপর লুটিয়ে পড়বে নিশান গাঁথবার আগে । দুনিয়াজাহান গাঁদলায়
ডুবে গেলে সেও ডুবে যাবে নাস্তানাবুদ হ'য়ে খাদে! আর আমি ভীষণ বিব্রত
ঠোঁট কামড়ে দাঁড়ায়ে রব দুই হাতে জড়ায়ে নিশীথ মন্দিরের ঠাণ্ডা গরাদ ।

১৫

তাতানো রাস্তায় দু'পায়ে ফোস্কা, পারব পৌঁছুতে গোবিন্দাসিতে?
আকাশে সূর্যের চলছে মাতলামি, মগজ মিশতেছে যমুনায় ।
বিকল ডানা ল'য়ে চলেছে চিল এক আমারই মতো সে-ও অজানায়,
মানুষ ব'লে তারা দিচ্ছে পরিচয়, বিভেদ শুদ্ধ দাস ও দাসীতে!

কোমলে রেখাবে শুনেছি র'য়ে গেছে গোপন-মিলনের স্থায়িত্বে
অন্য কারু হাত, সে বেটা থাকে নাকি অর্থহীনতায় ভাষার বাইরে?
ভিতরে তবে কেন গলছে পিচ-পথ, এই কি খাসিলত অচিন চিত্তে,
শানানো কিরিচের ধারের নিচে ফেলে কল্লা দুই ভাগ করব ভাইরে

চলেছি ছুটে তাই, সঙ্গে নিয়ে যাই অন্ধ গায়কের গানের মুখ
মূর্তি ধসিয়ে আরেক মূর্তির আদল গড়বার দাসত্বে ।
থাকবে শুধু পিঠ, নিপুণ কংক্রিট, বাঁধাই বন্দি-র বধির বুক,
ঘুমাবে একসাথে নরকে একরাতে আঘাতে আঘাতে মিথ্যা-সত্যে ।

আমার পথ চেয়ে না-খেয়ে না-দেয়ে গোবিন্দাসিতে ব্যাকুল রাত্রি,
বৃথাই বনেছি রক্ত বলকানো নিরুদ্দিশাময় পথের যাত্রী ।

১৬

দ্যাখো, দ্যাখো, কত ছোট আমি,
সহজেই জায়গা হবে তোমার কবরে,
লাগবে না ছাদ-ফাদ– উদ্বাস্তুর ঘর
লাগে নাকি যদি থাকে মূর্ছনা স্বরে!
শুদ্ধ নামিয়ে দেও এই ঘোর জ্বর,
বরফের কন্দরে বসে কেন ঘামি?

একটা হঠাৎ ডাল নুয়ে যদি পড়ে,
পাতাগুলো উড়ে যায় দূরের নিকটে,
যদি ছিলে ফ্যালে ছাল কর্কশ কাঁকর,
কৃতাঞ্জলি ল'য়ো তব পরা-সংকটে ।
ঘুমিয়ে থাকব আমি, হব না বাসর
তোমার নিশ্বাস যেন বহে অক্ষরে!

কবিতা

# ন ব্ব ই য়ে র  দ শ ক

পা ব লো  শা হী

## উৎসর্গ কবিতা

মৃত্যু থেকেই আমার জন্ম, উদ্ভিদ-খনিজ
লোহাপুড়ে লাল, ছাই ভস্ম হ'য়ে জন্ম ।
আমি সূর্যকাল থেকে জন্ম নিয়েছি, চাঁদের
বমি করা বালির উপরে বড়ো হচ্ছি ।
যতই ফসলহীন, ফলহীন, ঋতুহীন
কর-না আমাকে । যতই আমাকে মেরে ফেলো
আমি বারবার মৃত্যু থেকে জন্ম নেব
মথুরা– কৈলাশ
ভ্রূণের ভেতরে রক্তে রক্তে জলে-জলাশয়
জন্ম নেব মাছ, পাখি, সেগুন মঞ্জুরী
জন্ম নেব ঋতু, খনিজ আকর
আমার জন্মের শেষ নেই, মৃত্যু থেকে বার বার...
আমি, আমিদের, আমিগুলি
মৃত্যুকেই, ভয় দেখাবার জন্যে ।

১১ই জুলাই ১৯৯২
[*দূতসুড়ঙ্গের বীজ থেকে*]

## দ্ব্যর্থ দুঃখকথা আর গৃহগান

তোমার কিছু অতিরূঢ় দুঃখকথা শুনেছি আমি। শুনেছি দ্ব্যর্থ মর্মকথা, অশক্যবিষাদ। ওগো গৃহগান, চঞ্চল এ মনে তুমি উড্ডীন এক চরাচর। ইতস্তত, সেই নদীতীরে আমি গুরুকে শুধাই। আর বলি, এই শূন্যতার পারিপাট্য বোঝেনা হাজারও একজন। সেই হৃদিগ্রাম, সেই ধু ধু নদী; সেই স্মৃতিতপস্যার উপহাস নিরবধি খুলে দেয় বোধনগ্রন্থি, কপারটির ইতিহাস।

সেই থেকে এতদিন ধরে রাখা; বুকের বায়ুযান কুঠারে ছিঁড়ে জুড়ে দেয় নির্বাণের সাঁকো। আর সে কথা জানি দূরে নয়, বোধি আছে যোগিনী তোমার আলিঙ্গনের চাপে।

৫ই জুন ১৯৯৯
[*ইহা এক অভিনব কাব্যভজনা* থেকে]

## অব্যাহত সেই রহস্যকালে

শ্রীযুক্ত শনি, দিলসে তোমার; আবরণ উদ্‌ঘাটনে
মন ও পবন হয়, কাঁসি আর ঢোল।
অলক্ষে নেমে আসে, দেহরূপে; কাপালিক হয়ে
চোলাই পান করি; করি অমৃতস্য-গোল।

অব্যাহত সেই রহস্যকালে; ভবনির্বাণ খোলে
শূন্য মনে লোকাচার ঢোকে, তথাগত; যোগিনীর সঙ্গে থাকি
কাহ্নু-ডোমনী, সদগুরু বাজায় কাঁসি আর ডোল।
প্রাণ যায় তবু, শরীর পোহায় কলিজার; এশেক রঙ্গে।

দুঃখনদী খোলে, গুরুর মগ্নতায়; মূঢ়-বাঁধন
তাসের ঘর ভাসে– ভবসিন্ধুতে; অবিদ্যার-পর্যটন ।

২৬শে জুলাই ১৯৯৯
[*ক্ষম ওঁ নিঃশ্বাসযান* থেকে]

## সে এক বিদ্যুৎবালা অধিপ্রাণে গাইয়াছিল অঝোরে

মুমূর্ষু দীর্ঘশ্বাস সমীপে মনে পড়ে- সে এক বিদ্যুৎবালা; অধিপ্রাণে গাইয়াছিল অঝোরে... । আজ তাকে মনে পড়ে, চুম্বন ছড়াতে গিয়ে বিঁধে গেছি তার; দ্রাক্ষাসরোবরে । নাকি অর্গানবিধুর; স্বরে-ব্যঞ্জনে– পরিভাষা ভেঙে, মর্মর সে মিথ । সে কথা লিখি কোন খাঁচায়, তবু অঙ্কুর পাঠে ভাসাইয়া দেয়; রহস্যকাল । এই সব সান্ধ্যবচন; খরশব্দ অবমর্ষ জল আর উন্মার্গের বাসনা আর নারীকথা, গ্রন্থন, নিঃশব্দে ফুরায় জানি তবু । ছেঁড়াকথাপুরে থাকি; একা গৃহে ডাকি তাহাদের, দিবসের বিষণ্ন প্রাঙ্গণে । দগ্ধনাদে কাঁপে মেঘবালা; বলি তাকে জানপহেচান । তোমার মাঝেই জলের স্বভাব; লাবণ্যস্পৃষ্ট হয়ে হৃদি-খুলে দেখা । সেইখানে ফুটিয়াছে এই মহাতরু; অমৃতব্য ভাষা ।

২৪শে নবেম্বর ১৯৯৯
[*মেঘবালিকার মুদ্রা* থেকে]

## বেহেশতি আদি সহি হুরিনামা যাহা কেবল নরগণ পাঠ করিবেন

ব.
নরগণ উহা পাঠ করেন; যাহা অধিক বিশেষণ, যাহা সর্বনাম । আর তাহা নারীগণকে বলেন, কায় ভাসিল দেহ, ওলো ডোমনী; আমি তোকে সাঙ্গা করি অধিপ্রাণে । আর দুঃখের নীরবতা ভাঙি ভাষাপুরাণে । আর আমি তোকে স্পর্শ করি, তোর বুকে মুখ রাখি তোর শিশুবর... । লিখি শব্দহীন সে কথা; যাতে ক্রিয়া হয় না; অব্যয় হয় না । তবু বলি কথা; নরগণ-মান্যবর । ও ডোমনী– সব ভুলে আজ; তোর হেতু গণ্য হইবার; সাধন

করি যোগাচার... । আর তাকে প্রণাম জানাই, সামান্য এই নান্দীপাঠ, যে ভাসালো দেহে?

২৬শে নবেম্বর ২০০০
[*বেহেশতি আদি সহি হুরিনামা যাহা কেবল নরগণ পাঠ করিবেন* থেকে]

## শব্দবিশারদগণ কহেন উহাপেণ্ডুলাম শরীরের গোলাকার মহাপ্রাণ ধ্বনি

গ.
এইভাবে মন হারায়; অধিক বিশেষ্যে বক্ষবন্ধনীক্ষণে আহারে নারীবাক্য; তারে তুমি প্রকাশ্যে দিয়ো না ব্যথা । যদিও একথা বলি আর বারবার সেই ভারী বল নিয়ে খেলা করি; ভাবি, এ কোন মেটাফিজিক্স মরিব পরাণ থরো থরো... ।
সেই থেকে কায় ভাসিল সংলগ্নজনের পেণ্ডুলাম; সকলেই জানে; তবু কেউ জানে না? এ কোন রহস্যসূত্র; দেহকাণ্ড খেলা । নাকি সমস্ত ভুলের ঘোরে; মন হারাইলো ভবে । কিন্তু সে কথা না বুঝিয়া সে বাহিরিয়া আসে, অভিনব উহা এক গোলক; পেণ্ডুলাম দুলিতে থাকে আর বলে মরিব একেলা এই মম; বর্ষামঙ্গলদিনে ।

২০শে মে ২০০০
[*শব্দবিশারদগণ কহেন উহাপেণ্ডুলাম শরীরের গোলাকার মহাপ্রাণ ধ্বনি* থেকে]

## ঘোর ঘনঘটা কায়া মণ্ডলে তব কথা গুনে আমি বিমনা হই

লক্ষ পৃষ্ঠা ব্যয়িত হয়েছে এই বোধের অধিক মম বন্ধু তরে; তারপরও দেখি অর্থের অধিক তব মনে হালুম বাস করে । এই ভাবে বিঁধে যাই, ডোরাকাটা থাবাতে সমর্পিত হই । কেমতি তুমি বোঝ নাই; অপরিচয়ের ব্যক্ত এক ঘুঘু কেবলি হয়ে ওঠে তোমার আমার দেহভার । কোনো অর্থে মায়া প্রেক্ষাপটে ডোবে ভব সংসার; কবুতরের ডানা নিয়ে পার হবো এ চাঁদেপড়া সময় । যদিও তুমি লিপিবদ্ধ সারা পৃষ্ঠা জুড়ে । তবু

অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে আমি দেখি কাগজের বাঘ; কেমন হালুম করে বলে কেগো রাত্রি সাধ রচয়িতা, কি তোমার হর্ষলিপি, কি তোমার সাধন যোগাচার ।

১৬ই এপ্রিল ২০০০
[*কহে কবি নবীন বাল্মীকি* থেকে]

## তোমার অধিক, কোনো অর্থ নেই

তুমি তো কবুতরের কার্নিসে ঝুলিয়ে রেখেছো মোর বায়বীয় নাম; তাই নব গুঞ্জনমালা মাথা উচুঁ করে হাঁটে সেই পরিবেশবাদী ভাবাবেগে । তবু, মুদ্রাগুলি সব দ্বিধা পিছে ফেলে আমরা হাঁটি নদীতীরে ।
তারপরও মহাকালের বুকের ভেতর থাকে বসন্তকালীন লেবুবাগান; আর জলহাঁস হেঁটে যায় জলের শহরে তবুও, তার থেকে বড় আমাদের কথা; যারা জানে তাদেরকে বলি– ঘুম পাখিকে বক্ষে নিলে জেনে যাবে ভূমিকম্প পরিমাপক যন্ত্র । কে-না জানে, ভালোবাসা মানে– পিতলের ঘড়ায় ঋতুবতী হওয়া । অদ্য তুমি যাহা রাখিয়াছ রাত্রির নামে যে ভাষা কামুক কামাক্ষার ।
তার থেকে কিবা অর্থ তার যাহা আমি রচি; যা রাত্রির টুকরোর মতো মুছে ফেলি আর ভাবি এই অর্থের ও অর্থনীতির কোনো অর্থ নেই, কোনো ভাব ভাষা নেই, তোমার অধিক... ।

১৪ই মার্চ ২০০২
[*বর্ষা এবং আমাদের প্রাইভেসি* থেকে]

## পরাবাস্তব জামার বোতাম

চৌষট্টি.
জগতের শুরুর গল্পটা জানি আমি, শেষের গল্পটাও। একদিন কেরোসিনের বোতল হাতে বুকে আগুন ধরাবো বলে– শুয়েছিলাম জগতভুলের বিশাল ছাতার নিচে। তুমি বললে এই ভুল গল্পটা অদ্ভুত গাছের শেকড়ে লুকিয়ে থাকে। কিন্তু আমি যে নিজেই একটা ভুল যাকে নিয়ে জীবনবীমা, যাকে নিয়ে ঘোড়দৌড় খেলা কিংবা ম্যাচকাঠি বানিয়ে খেলতে চায় না কেউ। তারপরও অসময়ের ভুল ঘণ্টা আমি ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম জগতের ভুল বাগানে। জগৎ মানে তো অসুখকে জিব দিয়ে চেখে দেখা। যারা আমার জন্য পাঠিয়েছে সবুজ টিকটিকি আর শীতের হাতপাখা– তাদের জন্য বুক কেটে জমা রাখি বাঘিনীর দুধ। আর এসব কথার অর্থ বুঝে আমি বিকেলকে চুপ থাকতে বলি। কিন্তু শালপাতার রোদ্দুর আমার কথার মানে বোঝে না– সে বলে এই জগতে আগুন নিজেই এক হতভাগ্য ভুলের নাম।

১লা আশ্বিন ১৪১৮
[*পরাবাস্তব জামার বোতাম* থেকে]

## ডে ভি ড স জ্জ ন বি প্ল ব

উল্কার ওজন বেশি–তারার কম
(প্রতি কবির এপিটাফ)

কতোনা ফুঁ-ফাঁকা আসমান এই
ভাসমান খালি
কতোনা চওড়া সমুদ্র এগুলো
তরঙ্গেরা ফালি

চাবা'র শানানো ধার ভোঁতা

দেইখা করাতে খাঁজকাটা–টান
কম্ম–তো করতেয়াছি
পাবা'র বানানো হাসি
ছল্‌কায়–জোরছে দে তালি
চাবা'র-পাবা'র কাটাকাটি
করতালি মুহুর্মুহু ঠাস্‌
'সাব্বাস'–কইলো কেডা ফাও
ফাঁকা'র মইধ্যেখানে
ওই ব্যাটারে নাচাও–

ভাসা ভাসা মুদ্রাগুলা
ফালি ফালি ঢেউকলা
কিনারে আছাড় যদি লয়
এ ভঙ্গির অপচয় ক্যাঁ–গো
কি-না অন্যায্য সে দাবি স-বো
ভাসা'র আকাশে গিয়া কছি–

ফুঁয়াইয়া ফুঁয়াইয়া ঝিমানো শরীলটারে
যদি ধর‍্যা রাখবার পারে তো দিছি ফুঁ–

ফেনাগুলান্‌রে বাজাই
(তারানা–সমুচ্চারিত শব্দঘণ্ট সংঘটনা)

হউক–
হউক কি না-হউক
আমি তার ঢেউ ছুঁয়া কই
আস্‌লা যখন ডুবসাঁতারে
ভাসুক জাহাজ ফেনার প'রে
দেখিনা ভাসিনা
আই কি ফিরিয়া
এই গোল দুইন্নার প'রে

এই ফেনার উপরে–ঠিক

এই ফেনাতে
এ তারানা'তে

ড্রেক-কুক-ম্যাগিলান
সান্তামারিয়া-পিন্তা ও নিনা
ভাসি না
আসি না

আই আর যাই
রয়া থাকুম কিল্লাই
ঘড়িত্ দম দিয়া
মিহি কাঁপে হিয়া
ব্যাক্‌গুন্ ঘড়ির সময়
এ্যাক্‌লগে বদলায়া যায়
ক্যাম্‌নে ক্যাম্‌নে জানি–

হউক সে যেম্‌নেই
বদলায় তো আর কি
রওনের কি আর যাওনের কি
এই ঢেউয়ে সাঁতারে
মাঝারে আর কিনারে
যাইতে থাকলো তারা–
ঢেউয়ের ইশারা
প্রতিবিন্দু সিন্ধু সিন্ধু রব
বিত্তের বৈভব
ফেনায় মিইশা যায় হায়
সফল ওঙ্কার ধ্বনি
শরীল-সিম্ফনি রয়
সিন্ধুর বক্ষেতে পড়্যা
জায়মান গ্যালাসিয়া–

আম্‌গো দখল-সিন্ধু
ব্যাদ্‌নার উঁহু-বিন্দু
বানের টানের তোড়ে

অয়ি পিগ্‌ম্যালিয়ন
ফেনার ফুস্‌কাগণ শূন্য শূন্য হন
শূন্য বা অ-শূন্য কই
শূন্য থাকলোই
সফেনা
তারানা
দের-দুম্‌-দানি-ওদের-নাদের
আলা
নু-না-না-না-না-না.....

## রূপকথা '৭১ বে-বাক–চূড়ার মুখে মুখে

ওসব কথারা যাগো শিরা-উপশিরা
কোঁচ্‌কায় বয়সের ভারে আন্‌বাড়ে
একাত্তরে খান-কা'য়ে হোচট্‌ থুব্‌ড়ে
তৎদুর মদ তা'গো মত্ততার পারা

দাবড়ানো ঘোড়াছুট্‌ চি-হি-হি মুখর
আন্ধার ঘাঁইটে ফেরা হাঁটু কি-বা ক্ষুরা
ক্ষয়া যাবা ময়দানে খোয়াবে কাতর
তের্‌ছা তাগো'র মতি খেম্‌টা– কানাড়া

যেই তালে গুরু গুরু মেঘেত্‌ বিজুলী
মগজ ছিটকে ফোঁটা পাল্‌টানো খুলি

সাধের সিথানে থুছি সে পাবা'র বেদ
ধড়ের খোলেতে নিছি বেগানা সে আয়ু
শোনিত-তুফানে নাচৈ উত্‌রোল বায়ু
মাস্তুলে নিশান রাঙা উড়াই বিভেদ..

# পাখ্‌না আছে তো

বি-দ্যাশে বেড়াই–বিদেশিনী
তুমি ও-দ্যাশে আমি এ-দ্যাশে
মইধ্যেখানে শূন্যের জোড়া
মইধ্যেখানে শূন্যেত্ ওড়া
বেতার-পত্তর
এ-ঘর ও-ঘর মইধ্যেখানেই বেড়া

–কথাগুলান্ শুনতে পাই
আম্‌গো'র পৃথিবীডা ছোটো
ঘরেত্ বসিয়া শুনি
নিরঞ্জন ধ্বনি
গুনি–
তোমার নগরে বাজে ক'টা
কয়ডা আলোকছ্‌টা–সূর্য্যমুখী
পাইয়াই সুখী
অসুখীও

শুনি-ও অনেক গান
শূন্যপর বাতাস-সমান
যাগো'র মোকাম
ধরো–
'পক্ষী ওড়ো পক্ষী ওড়ো
কিসের বাহানা
পক্ষী বসো আমার দোরে
শীতল বিছানা'
–বসেনা তেমুও খালি ওড়ে
পাখ্‌নার তোড়ে
জমিন নইড়ে যায়
বিদেশি-ও
তোমার ক্যামোনত'রো–ধারদেনা

ধারো কি ধারো না
সব ঋণ–
শূন্যেত্ বিলীন
হয় কি হয় না
তয় কি তরঙ্গবিহীন–এ
পরাণে বাজ্না বাজে

তোম্গো সমাজে
কি-গো রীতিনীতি রয়
সীমানা টপ্কাইতে গিয়া
কি বিপদ
ক্যামোন কইরা কই–

উড়াল ডানার ব্যথা
ডানাত্ থাকলো গাঁথা
পর্যটকী সই
রই

## চুম্বক

কি হোঁচট্–রাস্তার পরেতে পাতা বুক
মগজে লোভের লালা ভরজীবন মৌতাত্
মাথাত্ কি ফুটপাতে মতি ধুরন্ধর
ভিড়ের অন্দরে যেই ঘূর্ণিঘোর
এ্যাক্ঘুমে ভোর হবে কি হবে না
চাগানো যাবে না–খালি হাঁটো হাঁটু
থাম্বা না–রঙের রঙিন কণা
ফস্কানো মুঠো–কি হোঁচট্
ফুঁইলে ওঠলো ঠোঁট–চাটো লাভ-লালা
হবে'নে মৌতাত্ পাইলেই হাতে
এট্টু সইতে হয় বুকে-ঠোঁটে

লালা-ফোঁলা চুমাচাট্টি জোস্
রাখ্বা সাহস মরদের পা'য় পা'য়
স'বার তাকত্–রাস্তার পরেত্ খেল
এ্যাট্টা জীবন ফুরোলেই ফুস্
বাতাসের ফণা–চাইয়া লইতে অয়
জীবনডারে চাইটা-চুইটা খাইতে হয়
রাস্তার মইধ্যে ঠোঁট
চুমা–দু'এ্যাক হোঁচট্

## এ্যারেনা কুন্ডলে
## (ইথারে হাত্ড়ে পাবা ধারাভাষ্য-মতে)

ছুঁয়্যা দিছি–ষাঁড়ের-ঘোড়ার ক্ষুরা
অ-গো'র গোড়ালি তাগো থুয়্যা যাবা পা'ও
তোমার মতন ছোঁপ্–তাগো'রে নাচাও

পরপর অ-ধরা মগজে তার-কি-বর্তনী
এ্যান্টেনা আগা'ও যে-বা ফিস্ফিস্যা স্বর
হেরেফেরে ইথারের থরে কি-ভাইব্রেশান
শুন্যা নিছি–কি কথারা তারা
ইশারাভিনয়–চাউনিতে চায়া
পা'য় পা মিলায়া হাঁটাহাঁটি
কম্ম–অ-কম্মের শীত ফাটাফাটি
নিত্য গোস্তের আঘ্রান ওম কি-আগুন
নজর ঝিলিক্ রাইতে–আন্ধারে ঘোর
বুকেত্ চিলিক দিয়া ঘুমশ্যাষে ভোর
কতো কি মনের জোর নজর-শাসানি
শুষ্যা লিছে পানি কণ্ঠশুষ্ক

ভাসে গ্রীষ্ম কি শীতল বায়ু
সেই যে জরায়ু-লালা–আড়চোখা
আম্গো'র খেলা পায়ের কাবাডি

মাঠে ছুঁয়্যা দেবা ধুলার গতর
কোটি কইতর খুঁট্যা খায় খুঁত্
যুতমতো ঠোঁটের আয়াসে ত্রাসে
কি-সন্ত্রাসে–খুঁজতে যাইয়া
পথে ঘামের-মোকাম বিন্দু
গলা শুকাইয়া কাঠে না-আগুনে
চাপানো দুরভিসন্ধি–জ্বালানোর আগে
চুলায়-শ্মশানে–সে ফারাক
কর্য়া নিয়া মিটমাট্ দে' আগুন ঠুক্যা

হাড়ি-পাটাতনে যেই যে ব্যঞ্জন নিয়া
দিছে দৌড়–ছোটার বাখানি
পরমান্ন মানি কি না-মানি
এগো'র তাগো'র ঝাঁঝ ঘ্রাণরন্ধ্র
পথ দিয়া গ্যাছে যারা কি যাইতেয়াছে
পাইছে কি টের না-কি আন্ধা দুইহাতে
হাত্ড়ায় পাছে সে-গতিক
বেচাইন ঘ্রাণেত্ পথিক–খুঁজ্যা
বিয়াকুল ছুঁয়্যা ছুঁয়্যা চাখে কি-বা
গতির বিপাকে রয়া সে জানতো–
যে ঝাঁঝ্ ঘোরতেয়াছে–তার পাছে
স্বাদের রচনা সাধ্যমতো
ঘোমের অন্দরে সে বিগত

যদি উঠাই অ-গো'রে দোরে
ঠুক্যা দেই কড়া খটাখট্
উঠ্যা আসে স্মিতহাস্যে না-কি
কট্মট্ চোখে চাখে ঠোকার আগুন
তে-গুণ চিতার পাটাতনে দাউ

জিগাও তাগো'রে রতি কোন্মুখো
ডাকার প্রথমে 'শীতে নাকি ওমে
কি তে-গুণে ধূমায়মান সে ঘুম
বারুদ কপালে দিছে চুমা প্রেমে'

আকুল শরীল কি মগজ নিয়া
খেলা সাঙ্গ দিয়া এ্যারেনা-কুন্ডলে
–যেই মাঠে খোয়া যায় দৌড়
নেশায় বিভোর হয়া
মাঠের শ্যাষেত্ গিয়া
পিছেতে চাইলে পাই শুধু ছোপ্
উল্টা উল্টা পা'ও–ফের তাগো'রে জিগাও
হাঁটার রাস্তারা কোন্মুখো
গো-ক্ষুর-মুখর কিবা থুয়া যাবা ছোপ্
নিশানা উল্টা যদি হয়–তয়
যাবার গতিক মায়া মাত্র
আসাটাই যত্রতত্র আছে পড়্যা
মুখ থুব্ড়ায়া–পথে কতো ঘোর
মুখরা গতর তার গতি ঠ্যারে

ছোটার ওধারে সাদা চাউনিতে
তাগো'র ইশারা বুঝ্যা নিতে থামো
ভাবা'র পানি নামো–ভেজো কয়বার
তা-কি সাবাড় বোঝার কারবার
–বাকিরা আন্ধামতি ঘোরে
চোখের দেখার কম্-জোরে
বন্দি–এবার কেবল সন্ধি
মিলমতো সুরে
ভঙ্গু'রে-অসুরে–
'য্যাতোডা পায়ের তল
তার'চে জোরের ফল
পাকা হয়া আছে চিহ্নে
বা-মনোমালিন্যে যেই মতি
পেশিময় অধিপতি'–জ্ঞানে
কি-অজ্ঞানে থুই প্রশ্নভার–

জর্জরিত পারাবার বুকে
শীতল ব্যান্ডেজ থোও গুঁজ্যা
দংশন-মতে ওঝা সেই পথ্যে
কি রয় নেপথ্যে

## ফোটে প্রেম

ঝাঁকে ঝাঁক্ নীরবতা ছুঁড়্যা দিছি
তোগে'র মুখরা হল্লা হাওয়ার প'রে
যা-যা নড়ে কথা-মুখো
উখো'র ঘষায় ওঠে রঙ
ঝক্মকা চিৎকারে খিল্খিল্
উল্লাসে–বুকের হরিণ হাসে
হয় ছুট্ টগ্বগা
অরণ্যে ফাগুন লাগা
কস্তুরিত নেশা আলুথালু–চক্কোর
তোগের বুকের ঘরে ঘোর–ইট ভাঙা
হাতুড়ে হইছে ধুলা রাঙা
খোয়াব-সিমেন্ট লেপা চূড়া
হাওয়ার বুনন ফাঁড়ে শানানো ফলায় ফড়
চৌচির তরঙ্গ ভাঙা চেঁচামেঁচি ফুৎকার
রাইতের আন্ধারে হইছে সার

যেইনা নামলো ঝাঁক্গুলো ঝিম্
কথারা আফিম নিয়া বুকে ঢুলুঢুলু
নীরবতা ঝাঁক্ দিছে উলু আনবাড়ে
মগজে উলুর বিনুনি-কিসিম্
রক্তের আন্ধারে যাবা-আসা সারে
রঙ হছে নীল
নীলের মিছিল

ফিস্‌ফিস্যা
কানাঘুষা
জাড়ে

কিলবিল–ঝাঁকে ঝাঁক্ নীরবতা নড়ে

## চোখরাঙা

এ্যামোন আমার ক্যানে চোখ
চোখা-রোগ
নাঙা ভুখা গতরখাগী স্বপ্নেরে
গিল্যা থাকি

ঘুমে–নিদের কুসুমে চোখরাঙা
চাঁন আধভাঙা
চোখের খোরাক্ নাকি আনবাড়ে
ঘুরঘুর চোর
আন্ধারের পুর এ্যাক্‌লা সাবাড় করে
নর্তনে দোষমুদ্রায়
ভঙ্গির দুপুর খাক্ চোখের মইধ্যে
দোষে-ঘামে চুর
চূরখণ্ড তনুভূতি পাছে ঘুমঘরে
চৌচির আরতি
নজর অসুখে রাত্রিবর আড়চোখে
ক্ষিদার নগর
রাঙাচোখে সাধে ভীমরতি
চোখা-প্রেম
শানদন্ত গতর-আকুতি
নিশি-মেধা

বিঁধা-রাত্রিবান ঝাঁঝ্‌রা পাঁজর
সই স্বপ্নখোর
ভঙ্গির অঙ্গেতে এ্যামোন অসুখ ক্যানে
মানি তার মানে

জা হে দ  স র ও য়া র

## মাংসের বাজার

দেহ থেকে দেহ খুলে নিয়ে
কবর থেকে উঠে বাজারে প্রস্থান করি
মৃত মাছগুলো দেখি
সঙ্গমশেষে যেভাবে তুমি পড়ে থাকো বিছানায়
রক্তমাখা গরু ঝুলে আছে
ওপারে ধূর্ত কসাই

মুহূর্তে আমাকে নিয়ে ঘুরে উঠে এই বাজার
যেন আমি অই রক্তমাখা ঝোলানো গরু
আমার চারিদিকে নিরাপদ দূরত্বে ছেনি
হাতে তোমরা সবাই
কেটে বিক্রি করবে আমার মাংস

বাজারের থলেটা ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখি
ফের নেমে যাই কবরে
মেতে উঠি রতিযুদ্ধে তোমার মৃতদেহের সাথে ।
ইচ্ছা হত্যার নেপথ্যে

আমার সন্তানের চৌদ্দমাস বয়েস
বাসার বাইরে যাবার জন্য সে পাগল
সদরদরজা খুলে বাইরে নিয়ে গেলেই

সে নেমে পড়ার জন্য যুদ্ধ শুরু করে ।
প্রথমে হাত-পা ছড়াছড়ি, নেমে পড়তে চাওয়া,
কান্নাকাটি, এরপর কাজ না হলে দু'হাতে
খামচে ধরে পিতার অনমনীয় মুখ ।

অপহরণ আর শিশুহত্যার ভয়ে
আমি তার ইচ্ছা প্রত্যহ এভাবে হত্যা করি ।

## ব্ল্যাক কমেডি

কার জন্য এই সাক্ষ্য রেখে যাবে তুমি!
কাকে দিয়ে যাবে এই শব্দগুচ্ছের ভার?
যখন সব আত্মা বিক্রি হয়ে গেছে
সুইমিংপুলের নীল জলে;

সে কি কোনো অবতার, যে সবজি খায়?
নাকি কোনো মহিলা কবি
যে কিনা মধ্যরাতের ওমের চাইতে ভালোবাসে কবিতাকে;
নাকি সেই আধাপাগল কেরানি
বউ-বাচ্চার ভারে যে দিয়েছে টাইয়ের ফাঁস

তোমার এই রাতজাগা সংলাপ
এই সুপরিবাহী ছলনার গান
এই আত্মগ্লানির বিদ্যুৎ যার বিস্ফোরক
ব্যবহার করছে আত্মমৃত্যুর বিদঘুটে রসদ

কাকে দিয়ে যাবে এসব সংক্রামী যাতনা?
দৈনিকের কোনো হাস্যকার সাহিত্য সম্পাদক?
যে ছেপে চলে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় থাকা
হাবড়া কবিদের বাজারের ফর্দ;
সেইসব আধা-দেউলে প্রকাশক

মধ্যরাতে যাদের বেড়ে যায় পেচ্ছাপের বেগ
আর সেই অবস্থায় যে দরখাস্ত পাঠায়
ঈশ্বরের কাছে কোনো জনপ্রিয় কবির মৃত্যু চেয়ে

তুমি বরং এসব বেচে দিও ঝালমুড়িওয়ালার কাছ
উড়িয়ে দিয়ো বসন্তের বিকৃত বাগানে
এমনকি মুছতে পারো গু
নিদেনপক্ষে মৃত্যুের আগে করে যেও উইল
এক ধুরন্ধর উকিলের কাছে
তারা যেন যায় তোমার সাথে শ্মশানে কিংবা কবরের তলায়

## স্তন

তোমার বুক যেন দুটো কবরের মসৃণ প্রসার
যখন আমার হাত তুমি টেনে নাও স্তনের দিকে
মনে পড়ে মৃত্যুকে- যেন ছোঁয়া মাত্র জেগে উঠবে
এই ঘুমন্ত অগ্নিগিরি; আর
ফেটে যাওয়া স্তনের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে
লাভা, মানবশিশুর ভ্রূণ, শীতল পৃথিবী
যখন কবর দেখি তখনো তোমার স্তনের কথা ভাবি
ছুঁয়ে দেখি কবরের মাটি
এখানেও আছে নাকি আগুনের চাষ– কাম প্রবণতা

প্রবেশের আগে শোকের জন্য একমিনিট বরাদ্দ
তোমার স্তন পুরুষের গোরস্থান
তারা শুয়ে পড়ে শান্তিচুক্তি শেষে
দুই অগ্নিগিরির মাঝে আগুনের নদীতে
যেভাবে ঘুমিয়ে পড়েছে অনন্তকাল তাদের পূর্বের পুরুষেরা

## শেষ মিছিলের যাত্রী

আর কেবলিতো তুমি বলতে
মাত্র কয়েকটা দিন, কয়েকটা মাস
নিদেনপক্ষে কয়েকটা বছর
তারপর... । তবুও

একই রাস্তায় ঘুরে ঘুরে দিন কেটে যায়
একই মহল্লায় বয়স বাড়তে থাকে
একই ধুলোবালিতে পাক ধরে চুলে
একই মসজিদে আযান শোনে শোনে...

ধর্মান্ধ উন্মাদনা আর দেশ দানবের অন্ধকার

হাসপাতাল– জেল– বেশ্যালয়– পানশালা?
কোথায় নিয়ে যাবে তাদের তুমি
যাদের ভার পড়েছে তোমার উপর!

আ শি ক  আ ক ব র

## মৌলিক প্রশ্ন

আবার তোমার সাথে দেখা
আঁতুড়ঘরে ছিলে তুমি গরবিনী মাতা
কায়েসের কামিনী ডান স্তন একে দিলে

বাম স্তন দিতো ওকে
অথবা খুলে দিতো ঊরুর দু'ভাঁজ
কায়েসের সেই যুগ গেছে কবে
আমিও তেমন অসভ্য নই
নিজেরই সন্তানের দাওয়ায় ভাগ বসাবো
বলো– এখন কী করিবে তুমি
তুমি কী জননী হবে জননী আমার
শিব তো হয়ে ছিলো দুর্গার সন্তান!

## যুদ্ধ-১

দু'টি ঊরু ছড়িয়ে শে বললো–
এসো ঘুম যাই
এসো যাই জান্নাতুল ফেরদাউস ।
আমি কবি থেকে কারবাইনটা নামিয়ে রেখে বললাম–
ছোরাটা দাও তো লক্ষ্মী মেয়ে
রুটি আর সবজির জন্য যেতে হবে ।
আমরা শুনলাম দূরাগত প্রথমের সুতীব্র চিৎকার

## যুদ্ধ-২

শে ছিল ভালো গ্রাহাতো । তাকে সামনে পিছনে ব্যবহার করা যেতো । তারপরও তাকে মরতে হলো । কারণ শে যুদ্ধের বাজারেও সৈনিকদের কাছে টাকা চাইতো ।

## উন্মোচন

যমুনার বুকে বাধার সাঁতার
সে তো সমকাম
মথুরার হাটে ভিড়, বেচাকেনা
সেতো পয়সার উছিলায় শারীরিক লেনদেন
হায় আফসোস্ বনলতা সেন
রাধা যে রাণ্ডী
কৃষ্ণ যে কমরেড
তা জানতেই লেগে গেলো আড়াই হাজার বৎসর
এখনো রাধারা প্রদীপ জ্বালায়
বিজ্ঞাপন দেয়
কৃষ্ণরা কামলা খাটে
দহে দহে কালিন্দি ধ্বংসে লাল দস্যুরা দৌড়ায়

## অনেক দিন পর অন্য রকম প্রেমের কবিতা

খাঁচা দেখলে
পাখি
পাখি দেখলে
আকাশ
আকাশ দেখলে
আপনি
আপনাকে দেখলে
আলো কিংবা অন্ধকার কোনোটাই নয়
আপনি
আপনিই
অমরিকা কিংবা আমার ঘর যেখানেই থাকুন

## মহামিলন

মহামিলনে যেতে হয় একা, সঙ্গীবিহীন সংগতিহীন
উলুঝুলু শার্ট পরে স্টেশনে হাঁটতো যে লোকটা
নক্ষত্রের বস্তিঘরে ছিলিম বানাতো যে হাত
মনোচ্যুতি ঘটলে দুধ খাওয়াতো যে নীরব মেয়েটি
ওরা কেউ সঙ্গে যাবে না ।
মহামিলনে যেতে হয় একা, সঙ্গীবিহীন সংগতিহীন ।

## র‍্যাঁদা, মাইকেল এঞ্জেলো, কাহ্‌লীল জীবরানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা পূর্বক

হাড়হীন নীল জলে ভাসা হাত
ফেরাউনের হাত
ঐ হাতছানির ভাষা দ্বৈত
একবার বলে এসো
একবার বলে এসো না
আদমের আরো এক ঊর্ধ্বমুখী হাত
ঊর্ধ্ব থেকে নামছে আরো একটি হাত
মাঝখানে শূন্যতা
শূন্যতার মধ্যে প্রেম
আদমের হাত কী ছুঁতে পারে
ঊর্ধ্ব থেকে নামা ঐ হাত
আহ! কী তীব্র আকুতি দু'টি হাতের
পরস্পর পরস্পরকে ছুঁতে দেবার
না ছুঁয়েও ছোঁয়ার আবেশ কখনো কখনো ছড়িয়ে পরে দিগ্‌বিদিকে সর্বদিকে

## কলিযুগের কাব্যকলা– ২১

মাওয়ের মর্মমূল ধরা হাত শরৎ সকালে জাগালো আমাকে
ঘুম কালে কোন ভুবনে করি বাস প্রশ্নবান নিক্ষেপ করেছে
মাওলানা রুমির রোমিও ।
ভাবনার অদর্শনে ভাবনা ভেবেছি বসে বসে ভাসা ভাসা
ভাবনাকে দেখে বাড়তি বুঝেছে ভাবনাতে বাড়ি আছে
আছে বাড়তি মাংসের দোল– চলো বাড়ি যাই অবৈধ রাস্তায়
বৈধতার ভার বাড়িয়েছে বারবধূ গ্রাম
গোপন গমনে সব একই গোহালের গরু
এ এক আজিব কারবার আস্তা বাংলাদেশে
দুআর খুলে দুআরে দাঁড়িয়ে দুরূহ দূর হও লোক দেখানো চিৎকার ।

মর্মমূল ধরা মাও গেছে গ্রামে
গ্রামে গ্রামে বাহিনী বানাচ্ছে
বাহিনীর কাহিনীর ইতিহাস জ্ঞাত হতে হলে যাও গ্রামে
গ্রামে গ্রামে ঘর ঘর গেরিলা বানাও
কাশবন লাল করে ছড়াও শত্রুর রক্তের ঘ্রাণ
ব্রহ্মপুত্র পাড়ের মানুষ ব্রহ্মার পুত্র হও– বর্ম পরো
বুলেট বিদ্ধ হওয়ার আগেই টানো বন্দুকের বাঁকা ঘোড়া ।

## কবিতার কবিতা

০১.
কাফনে এক-আধটা পকেট থাকা দরকার
বিড়ি ম্যাচ রাখবার
না হলে কী করে ভোগ করবো দোযখের স্বাদ
কিংবা বেহেস্তের শান শওকত
বিড়ি ছাড়া– ম্যাচ ছাড়া

০২.
ক্যাপ পরে আছে চাঁদ
আর বিড়ালটা গর্তের মুখে খুব চুপচাপ
ছাগল নাদির মতো মাটির টুকরো নড়ছে
মেঘটা সরছে
ম্যাচবাক্সের প্রজাপতিটা উড়তে পারছে না ।

০৩.
আকাশের সব তারা নিভে গেলে যে নক্ষত্র জেগে থাকে
তার নাম না-বলাই ভালো
আকাশের দিকে তাকালে যে নক্ষত্র প্রথম চোখে পরে
তার নাম আশিক
এইভাবে আমরা পাল্টে দিয়ে
মহাজগতের সকল নক্ষত্রের নাম
বেঁচে আছি আজও

০৪.
আমি এক
কিন্তু অনেক

কবিতা

# প্র থ ম  দ শ ক

মা জু ল  হা সা ন

## জলদস্যুর আখড়ায়

আজ শোক যাপনের অনুমতিও দিলে না শুকতারা!

দূরে তৈরি হচ্ছে গভীর সমুদ্রবন্দর। পরানের গহীন আর্তনাদ
আমি তো ভুলে গেছি সব। আমার অন্দরে গাছ কাটে কে?
কে গায় পেশিবহুল গান 'ধোপার বেটি কাপড় কাচে
দুই কোলে তার বিলাই নাচে'। কে বাঁচে দরিয়ায় ডাকাত ছাড়া?
প্রিয় দোয়েল আমার; আমি তো ভেঙেছি হিমঝরি ডালের ধনুক
তবু কে শেখায় শরনিক্ষেপ–'লাবণ্য ভুলে হয়ে ওঠো
খুনিয়া লবণ'। সেই থেকে পড়ে আছি জল-থুথু-লালায়
জলদস্যুর আখড়ায় বসেছি এতেকাফ। চেয়েছি বাতিঘর

হায় শুকতারা কোথাও শান্তিকুটির নেই; নেই সারসের গ্রীবা

উৎসবের দিকে

## দরজা থেকে ফিরে এলাম, কারণ দরজা খোলা ছিল...

বুঝি না, উৎসব ক্যানো এত মদমত্ত অক্ষমের আস্ফালন?
চুরি করে যে বেলপাতা রেখে আসা হলো প্রযত্নে সুনেত্রার

তার গুরুভার, অনুচ্চ ঘ্রাণ; শিথান-পৈথান; ক্যানো পারে না
ঠেকিয়ে দিতে ডাকাত-আগমন?
এখন রাত। ছুরি-কাচি টুংটাং রংঅন্ধ রেডওয়াইন
পাখি ও পাইনের বন্যগভীরে কোথাও কোনো রাজর্ষি নেই
ছিল না কোনোদিন। অগত্যা এই মারীবীজ; বিগলিত মোম;
মোষের পিঠে চড়ে ডাকাবুকা ফেউসার দাপট।
'হায়! একটা ভারী চুম্বনও জুটল না জীবনে' এই আক্ষেপ
অদৃশ্য-শ্রবণে সুনেত্রা বলেছিল, 'গোশালা ছেড়ে একবার শুধু
খসালডাঙ্গির মেলায় এসো। এসো জয়ফল ও কোশা নৌকার দ্বীপে
সেথায় পাবে তুমি গোষ্ঠের মাঠ; আমাকে নাও, আমাকে নাও বলে
আলো দেখাবে আহত দিকচক্রবাল। আমি যাই, ফিরে আসি
দুয়ার থেকে। ভেতরে অপেক্ষা। ভেতরে কান্না; কলহাস্যের...

## আমার ফুলমাতাল শব্দরা

মুহুর্মুহু বুলেটের শব্দ বিছানো পথে আক্রোশ শব্দটিকে রেখে এলাম
৭ কোটি ৮ ক্রোশ দূরে। তবু কী রকম ক্রুদ্ধ শুনশান। জন্মদাগে লীন
ওহে ভগ্নি-জননী, কে তবে আমার ধ্যানের টেবিলে রেখে গেল
লেবুপাতার কুচিকুচি কান্না? কে তবে রেখে গেল ডুরে পাঞ্জাবি
চুড়ি আধখানা আর সুশ্রী ঝড় সকল?
আমার কলব-হলব সব উলোট-পালট হয়ে যাচ্ছে
লিখতে চাচ্ছি ফল, অমনি ফুটে উঠছে ৭ ফোঁটা জল
প্রিয় সেবিকা অপ্রিয় জলদাস, ডমরুর মতো আমার হাড়কালা শব্দরা
বদল হয়ে যাচ্ছে। গাছ হয়ে যাচ্ছে নাচ।
প্রেম হচ্ছে গেম। ভালো বলতেও কালো আছি।
প্রতিদিন তামাকজ্বলা এক গনগনে হাত আমার রোলেক্স ঘড়িতে
দম দিয়ে যায়। ভালো লাগে। আমি দম ভালোবাসি। সবুজ ভালোবাসি
আমি সবুজ যম ভালোবাসি। ভালোবাসি আর গ্যাসোলিন কুণ্ডলীর ভেতর
সাইকেল চালিয়ে আসি ৩ চক্কর। প্রমাণ করি: লাল পূর্ণিমা শেষে
মানুষ জীবনের পক্ষে ছিল। আর রতি-অমাবশ্যার শুরুতে বুধবারে এসে
সেই নিষ্কাম ঋষি সরলার রক্তে পিপাসা শব্দটি লিখে দিতে পারে ॥

## পবিত্র যুদ্ধ শুদ্ধতম প্রেম

সমাচ্ছন্ন দুপুর ছুঁয়েছিলে বলে এই হাত এখনো বর্শা
অথচ বত্রিশ বসন্ত আর ততোধিক জলমগ্ন কদম সাক্ষী
দাপুটে আততায়ীর আরাধনায় একদিন কাটা পড়েছিল
যে আগর, ধানদুব্বা-চন্দন, ঝকমকি পাথর, ট্র্যাকিং করা
ছত্রীসেনা প্রেমিকাপ্রসবা এই ভোরে আজ তারা কেবলি
মতবাদখেকো মৃত কারিগর। মদ ও কবিতা সংহারের দেবী
আমি তো চোখ খুলে পকেটে রেখেছি, লাশের ভেলায়
পাড়ি দিয়েছে পথ। এখন করোটিসুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসে
থিকথিকে আলো। যা কিছু ধেয়ে আসে মনে হয় ঐশীবাণী
ভরাকটাল, বিগব্যাং, অশ্ব যাযাবর
অথচ হ্রেষাধ্বনি আর কবোষ্ণ খুরের ছাপ বলে দেয় :
পবিত্র যুদ্ধ ও শুদ্ধ প্রেম বলে জগতে কোথাও কিছু নেই!

## শান্তি সম্পর্কিত

হে মিতব্যয়ী সাইকেল, এতদিনে তোমার গামবুট ও কাঠের পায়ের
পুরনো ব্যথাটা একটু হলেও সারবার কথা। আর তেমনটি হলে
প্লাস্টিকের সাপ হাতে তুমি চলে যেতে পারো মহামান্য ফ্রয়েডের বাড়ি
স্বপ্নতত্ত্ব'র কয়টা ঠ্যাং? কী খায় তারা? অথবা পাটখালাসী?
কীভাবে সাড়ে ৫ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের একটা পাটকাঠির উপর দিয়ে যেতে যেতে
মানুষ লাফিয়ে পড়ে ক্রিস্টালের নদীতে? কীভাবে কেঁপে ওঠে
পৃথিবীর নাভি?
বিশ্বাস যাও জনার্দন, আমি তার জানি না কিছুই। তাই বলছি আসো
আমরা বরং শান্তিতত্ত্ব নিয়ে তাফালিং মারি জানোই তো

সম্রাট নেপোলিয়ন আক্ষরিক অর্থেই বিড়াল ভয় পেতেন। এই তথ্যের পর
বিড়ালকে শান্তির দূত ভাবলে ক্ষতি নেই, তবে তার আগে,
শুধু একবার শুনে নিতে হবে গৃহস্বামীর আর্তনাদ ইশ! খেয়ে গেল কী?
... দুধ!

## মালিনী মধুমক্ষিকাগণ

এক লজিংমাস্টার জীবনে কত কত কাগজি লেবুর দেশ
ডুবোচর আর লৌহজটা মুখ! আজ কোথায় তুমি মোমের পুতুল?
দিকে দিকে বেলুন উৎসব। ছন্দপ্রেমী জেনে যে নদীর জন্য
রচিত হলো নূপুর-নিক্কন; বুকের চামড়া উপড়ে গড়ে দেয়া হলো
অন্তরীক্ষের নকশা; জাদুর পাদুকা যুগল– আজ ভ্রমরগুঞ্জরণের দিন
কেন তার কম্পিত পদচ্ছাপ বেঁকে যেতে চায়
শরীরকুঞ্জ থেকে নারী বৈকুণ্ঠপুর?
আজ বায়ান্ন হাজার তেপ্পান্ন গলির মোড়ে মোড়ে গবেটের গোলাপ মন্থন
জানা হলো না পীতপাহাড়, সহবাস; কাকে বলে তুমুল সঙ্গম?
তবু সারেঙ্গি সারস হয়ে যায়। সৌরঝড়ে সুফিয়ার গাথা
মায়া ও ম্লেচ্ছ'র দেশে হারিয়ে গেলে পর' দেখা হয়ে যায় কাম জরজর
কোয়েলকাব্য। সেখানে মেলা– মালিনীর মধুমক্ষিকাগণ।
'হারিয়ে যাও, হারালেই মধু' বলেছিল সে। সে মানে অরুন্ধতীরাজ
গুপ্তরঞ্জক। খাকি ও খানকা থেকে বেরিয়ে আসা কুলনারীর শোক...

জা হি দ  সো হা গ

## দুপুর যৌনতা ও অন্যান্য

১.
দুপুরটা যেন-বা রৌদ্রের অফুরান ঢেউ। আর তুমি রিক্সার হুড ফেলে পুড়ে পুড়ে কয়লাবতী। এখানে দাঁড়াবার সামান্য ছায়াও নেই, পার্কে পুড়ছে পাতার মজ্জা। বলি, দ্যাখো দ্যাখো বুকের ভেতর ঘাড়ভাঙা ঘোড়াটা ফের দাঁড়িয়েছে– না না, ঠিক ঘোড়া নয়, কেশর, নাকি আমাদের হারানো শীতের জামা! তবু ধরে নেই সে রৌদ্রের শিশুগাল। যে কিনা তোমার চাবির গোছার মতো কোমরে ঘণ্টি বেঁধেছে শিশ্নকে সচকিত করে।
হঠাৎ একটা ধুলোর ঝাপটা, যে কিনা তোমার শাড়িকে মাতালের মতো পেতে চেয়ে চেয়ে ছড়িয়ে পড়লো আকাশে, নীলে। তুমি ছোঁ মেরে টেনে ধরলে যেভাবে মা দুষ্টু গাভীটার রশি টেনে ধরতেন। আর তখনই ন্যাংটো পাগলিটার চোখে চোখ পড়ে গেল।

২.
আমার হৃদয়ও সিফিলিসের মতো অস্বস্তি। পুঁজ আর বেত-কাঁটার আঁচড় যেন-বা বাড়ছে। আমি জানি নিশ্চিত কিছু পেয়ে গেলে মন পড়ে থাকে দূর পাহাড় ও ময়ূরে– যেখানে চিরদিনের বৃষ্টিতে ত্বকে জমেনি শ্যাওলা। আর তাই মুহূর্তের জন্য খুন হওয়া যায়, কিন্তু সারাটা দুপুর নয়। আমার মতো পুরুষ আর চায় না জেব্রার দ্রুতি বরং কাশ দুলে ওঠা নদীর ছায়ায় চুমুকে শান্তি খোঁজে অযথা রাত্রি কাটানোর। যেখানে একটি গ্রাম্য বেশ্যা এসে ডুবেছিল অপাঙ্‌ক্তেয় শিশুর কলরবে, তার বাড়ির নিম ফুলের মদ ও ধনেশের স্বর শুনে আমিও ছিলাম কিছুটা বিভক্ত– প্রেম ও নীলাভে। আজ দুটোই আমাকে ডাকছে একই অঙ্গে আর আমি পায়ের দিকে চেয়ে দেখি শ্মশান-ফেরা মানুষের নীরবতা।

৩.
এই মূত্রঝরনা ফুটপাতে দাঁড়িয়ে খুঁজছি নতুন রিক্সা। বাহারি নক্সাদার। যে কিনা আবার টুংটাং ঘণ্টায় ভাঙতে পারে রৌদ্রের হলুদ জঞ্জাল। আর রিক্সাওয়ালার নাম দিয়ে ফেলি সিরাজ-উদ-দৌলা। তুমি ভ্রু কুঁচকে বললে, না থাক ওর নাম... ওর নাম দিলাম পার্থসারথি। আমি তখন বাম রাজনীতি ছেড়ে ভদকার জন্য বরফ খুঁজছি। আর তুমি ব্যাগ ভরে এনেছো পাথর, যেন কাকের মাথায় ঢিল ছুঁড়লেই থৈ থৈ করে উঠবে কুয়োর জল। কখন যে রিক্সাটা তোমার নীল ব্লাউজের গ্রীবায় পেইন্টিংয়ের রঙ ঢালছে। আমি বলি, ওর বউটা তেলচিটে, আমার বাসায় ঝি'র কাজ করে।

৪.
ব্লাউজের ভেতরই এর সুরভি পাওয়া যায়। নইলে স্তনদুটোয় গলা চকোলেট কেন! পপিক্ষেতে দীর্ঘকাল ব্লেড আর রৌদ্রের ডানায় ঘুমন্ত থেকে সবে ভাবছি আমাকে বুঝি ডেকেছিল স্বৈরিণীর জঙ্ঘা। কিন্তু আমার তো রক্তে অ্যালকোহল, মানে বিষণ্নতার ঋতুতে ফলছে নিষ্ফল বিদ্যুৎ– যেন ভীত হয়ে উঠছি বদ্বীপে গুল্মলতায়। কিন্তু এমন তো ছিল না, নারী মানে যে মাংসের ফোয়ারা সে কথা ভাবি না আজো– তাহলে একটা মাছরাঙা হাঁটুঅব্দি জলে দেখে শুধুই মাছের কঙ্কাল!

এখন প্রতারণার মতো নারী আর পুরুষের রাত্রির বরফ জল। যাতে হয়তা উপচে উঠবে শ্যাম্পেনের মেদ। যাকে আমি সমুদ্র ভেবে মরে থাকবো চিলের নীলঘন আকাশে। আমার মতো পুরুষের তো দুঃখ করারও কিছু নেই।

৫.
আমার হাতেও দিতে বুনোফুল ভরা মধু; তাহলে হাওয়ার এই নীল ঘোড়া ব্যাটারিচালিত ইচ্ছের মতো আমাকেও ছেড়ে যেত না। এখন পাঁচিল ঘিরে আসছে কুমারপাড়ার ধোঁয়া– যেন আমিও কাঁচা মাটির পাত্র! আর সন্ধ্যায় উলুধ্বনি শেষে কুপির আলোয় দেখি সেই ঘোড়ায় আঙুল বুলাচ্ছে মাসিমণিরা। কোনো লুকোচুরি নেই আবার, একফোঁটা কুপির সামনে এলে তারা

আমার হাতে তুলে দেয় পোড়া-কাঁকড়া, যার ঘ্রাণে উন্মাতাল
আমাকে পেয়ে মেখে দেয় জলমাটির প্রলেপ। যেন-বা মেলায়
ভুলে যাবো নাগরদোলা আর রঙিন জলের স্বাদ।

৬.
হায় আমারও লোভ ছিল বাতাবিলেবু আর শালিকের মরে থাকা দিনের– কেন যে আমার মতো পুরুষও উদ্‌যাপন করে বিদ্যুতের জঙ্ঘা আর নিম ফুলের মদ; যেহেতু আমি রৌদ্রের ভেতর এক ঋতু অপেক্ষায় ছিলাম স্বেদসুন্দরের লোভে, তাই আজকে আমাকে বলো, আমার হৃদয়ও কি টেরোকোটার নাচ যাকে স্থির দেখি পুরাণের ক্যামোফ্লেজে!

না শুধুই নারী নয়– বাঘিনীও আজ খুলে ফেলে
ডোরাকাটা, নোখের হলুদ। যেন-বা এবার বর্ষায়
মনখারাপের দিনে প্রতারণা ভুলে যাব আর
বলবো দ্যাখো আমার শরীরও এক অসম্পূর্ণ
নারী। যাকে বিলিয়ে এসেছি হীনমন্য পুরুষ আর
বৃহন্নলার দিকে চেয়ে চেয়ে। হায় আজ তারাও
আমাকে দেখে ছুঁড়ে দেয় আধুলি দেয়ার ভঙ্গি।

## মি জা নু র  র হ মা ন  বে লা ল

## ফিসফিসানি

নরম সকালে অদৃশ্য ছায়ার ফিসফিসানি– হলুদ স্মৃতিপাতার কাছাকাছি,
নাড়ির টান, সবুজের গান– জীবনের জ্যামিতিক বৃত্তের ঠিক মাঝামাঝি।
উড়ে উড়ুক খয়েরি পাতার ফড়িং। ঘাসের তাঁবু জুড়ে সবুজের সার্কাস
দিনভর অভিনয়ের প্রথাগত বিষাদ– থোকাথোকা বিষে বিষাক্ত বিষদাঁত।
লোভের জোড়াচোখের উঠোনে এ কার ছবি? ঠোঁটের কোণে অন্ধ হাসি!

এ জন্যেই কি জ্যোৎস্নাভরা রাতের খোলাবারান্দায় নক্ষত্রের ফিসফিসানি?
এ জন্যেই কি সবুজের সরলতা কেড়ে নিতে হলুদ দুপুরের ফিসফিসানি?
কী অদ্ভুত প্রশ্রয়ের তারতম্য– সাদাকালো বিশুদ্ধ স্মৃতির সমাবেশ নিষিদ্ধ ।
জন্মদাগের বরফকুচি গলে যায়; জলনটীর ঈর্ষাকাতর যৌবন আগুনঘরে ।
দূরগামী বিনয়ের ভাষা জীবনের দূরত্ব জেনে– সময় সন্ন্যাসী পিছু নেয়
সবুজের বুকচেরা প্রস্থানের; সেখানেও রহস্যের ফিসফিসানি.....

## মঙ্গা

মাটির গতরে লাঙলের ফলায় শস্যহীন ক্ষেতের যৌবন ফিরে পাবে
কৃষক রোদের স্বর্ণরঙ মেখেছে চোখে-মুখে; ফসল ফলবে মাটির গতরে ।
যমজ বলদ লাঙল টেনে প্রভুর স্বপ্নপূরণে অদ্ভুত শক্তিদ্বারে অস্থির
সোনাধান সোনালি আঁচলে মাঠের উপর ওড়াবে থোকাথোকা স্বর্ণরঙ
পরিত্যক্ত আঙিনা নতুন উদ্যমে পাকা ধানের মিষ্টি ঘ্রাণে পালাবে মঙ্গা
কৃষাণীর লাল রঙের দাতের ফাঁক দিয়ে মুচকি হাসির রঙিন সার্কাস
নাইওর যাবে গোলাঘরের বহু প্রতীক্ষিত বাঁশের হলুদ শয্যায় ।

স্বপ্ন তো পোষ্য যমজ বলদ নয়–মাটির গতরে লাঙল চালাবে;
স্বপ্ন স্থির দাঁড়িয়ে থাকে কাকতাড়ুয়া মূর্তির মতো ধ্যানমগ্ন হয়ে ।
খরার তপ্ত দাহ্যে ফসলের মাঠ ধূ-ধূ মরুভূমি–বড্ড বিবর্ণ
পিতৃপুরুষের মঙ্গার কবজ ফের ফিরে আসে বরেন্দ্রপ্রান্তরে ।

আ ফ রো জা  সো মা

## অ্যামেরিকার প্রতি

মাইটি অ্যামেরিকা,
তুমি হয়তো জানো না
কিন্তু তোমার সাংবাদিকেরা জানে
কতটা বিষণ্ন আছে ইরাকের রক্তগোলাপ ।

তুমি হয়তো জানো না অ্যামেরিকা
কিন্তু তোমার দেশের
আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ান জানে
কতটা রাগ নিয়ে ফুঁসছে লাঞ্ছিত তিকরিত ।

তুমি হয়তো এখনো জানো না
তোমাকে যুদ্ধাপরাধী করে একদিন
মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলা আনবে
মার্কিন বুটের তলায় চাপা পড়া ইরাকের ঘাস ।

মাইটি অ্যামেরিকা,
তোমার ড্রোনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে আহত টাইগ্রিস;
ইউফ্রেটিস তুলে আনবে অধিকৃত ভূমির অপমানের দলিল;
শত বছরের মৌনতা ভেঙে কথা বলে উঠবে নির্যাতিত বাগদাদ ।

সেই বিচারের দিনে পৃথিবীর সবক'টি নদী হবে টাইগ্রিস
পৃথিবীর সবকটি ফুল হবে ইরাকের রক্তগোলাপ
সবকটি দেশের রাজধানী হবে প্রতিবাদী বাগদাদ
সেদিন ক'জন সাদ্দামকে তুমি বধ করবে, অ্যামেরিকা?

# অহল্যা

অহল্যা, তুমি উপাখ্যান
তুমি রূপক মাত্র ।
কল্পনায় তুমি হতে পারো
ব্রহ্মার মানসকন্যা এক;
তথাপি নারী তুমি
গৌতমের স্ত্রী,
ইন্দ্রের সম্ভোগ ।

ইন্দ্রের প্রবেশে তুমি
ক্ষত হয়েছো কি হও নি
তা নয় মুখ্য জিজ্ঞাসা;
জগতের সত্য হলো
তুমি অপরাধী;
তুমি যত কাম-জাগানিয়া ।

তুমি তাই পাথর হবে
তুমি তাই বসে রবে
রাম -এর পদধূলির অপেক্ষায় ।

পুরাণে তুমি আছো– অহল্যা,
রূপকের বিভিন্ন ধারণায় ।

রূপকে বলেছে–তুমি রাত্রি
মানে ঘোর অন্ধকার;
রূপকে বলেছে– ইন্দ্র সূর্য
চির আলোর প্রতীক ।
তাই, অহল্যায় ইন্দ্রের প্রবেশ
অপরাধ কোনো নয়
এ প্রবেশ আলো দিয়ে
আঁধারকে জয় করা ।
অতএব অহল্যা,

তুমি ব্রহ্মার কন্যা
গৌতমের স্ত্রী
ইন্দ্রের সম্ভোগ
তুমি জন্মেই পাপীয়সী;
তাই, দিবস রজনী বসে রবে
রামের পদস্পর্শের অপেক্ষায়;
তুমি চির অন্ধকার
চির অভিশাপ
তাই জনমে জনমে অহল্যা
সূর্য তোমায় করবে বলাৎকার ।

অহল্যা, তুমি উপাখ্যান
তুমি পরের কল্পনা
তুমি হেইপাসিয়া
তুমি ইয়াসমিন
তুমি রুমানা মঞ্জুর
তুমি মালালা
তুমি– ব্রহ্মা, গৌতম, ইন্দ্র ও রামের
আখ্যান তৈরিতে ব্যবহৃত কুহক মাত্র;
তাই, তোমার উপাখ্যানে তুমিই
তোমার অস্তিত্বহীনতার
সমূহ প্রমাণ– হে অহল্যা ।

## আমন্ত্রণ

পৌঁছে যাও দূরে– এমন দেশে,
যেখানে পানের রসে মানুষের ঠোঁট
লাল হয়ে থাকে সারাক্ষণ, যেখানে
লুঙ্গির খোঁচে পুরুষেরা গুঁজে রাখে টাকা;
সন্ধ্যার পর, ঘরে বসা কিচ্ছার রেশ,
গল্পের চরিত্রের সে অবর্ণনীয় ব্যাথা–

যেখানে আচ্ছন্ন করে রাখে এক-একটি নতুন সকাল ।

সেই দেশে টিভি নেই, রূপকথা আছে,
সে দেশের মানুষেরা আজও কেউ কেউ বলে বেড়ায়
কারো কারো বন্ধু-স্বজনের কামরূপ-কামাক্ষা গমন,
মায়াপুরী সে ভূ থেকে শিখে আসে জাদুর কাহন ।

সেই দেশে যেতে যেতে
তোমাকে সঙ্গ দেবে ঘোর লাগানো রোদ,
সঙ্গ দেবে– দুই ধারে আদিগন্ত বিস্তৃত ধানের ক্ষেতে
চিরকাল ধরে ছড়িয়ে থাকা– কিচ্ছার চরিত্র সকল ।

সে দেশের বিলের জলে,
সাদা, বেগুনি, হলুদ জংলি ফুলে ফুলে আমাকে পাবে;
রোদ্র সঙ্গ বাসে– আমি–
বুকের মধ্যে অবর্ণনীয় আনন্দ ধরে আছি;
এইখানে আসো যদি– তুমিও তা পাবে ।

## রূপকথা নয়

কোথায় রংধনু– সে হিসেব তোমার
আমি আছি চাঁড়ালের দেশে;
তবুও এ দেশ আমার ।

বাঁশঝাড়ে মাঝরাতে কেঁদে ওঠে যে পাখি
সে আমার অনাত্মীয় নয়,
জাল ফেলে আশাহত ফিরে আসে যে
সে আমার খেলার সাথী,
তার অভুক্ত সংসারে আছে আমার স্বজন ।

আমাকে দিও না দোহাই–

নগরের কবি, তোমার সুনাম আমার
স্বপ্নের সাথী নয় ।

বলতে পারো, স্বাতী তারা–
যে কি না দূরে আছে,
যে কি-না কিছু নয় রাজার কাছে,
জনপদে সে-ই এক বন্ধুর নাম;
আকালে সে গল্প জুগিয়েছে ।

মঞ্চ তোমার হোক,
দুধে ভেজা পদাবলী নিয়ে তুমি
রাজার দরবার রাঙাও ।
আমরা কুলি ও কামিন জন,
আমার ভাই লিমনের পঙ্গুত্বের দিনেও
ভয়বন্দি সবাই গোল হয়ে বসে
শুনছি তোমার রাজশংসা বচন ।

দূরে থাকা নগর কবি, চণ্ডালেরা জেনেছে–
বাঁশঝাড়ে কেঁদে ওঠা ঘুঘু পাখি–
সে তোমার নয়;
তিতুমীরের বাঁশের কেল্লায়
যে গল্প জন্ম নিচ্ছে– তা তোমার নয় ।
আমাদের ঘরে ঘরে বেড়ে উঠছে যে
কালিয়া মোহন্ত, কংকা মাঝি আর
ঘাড়ত্যাড়া কৈবর্ত যুবক–
এরা কেউ মগধ বা বৈশালীর রাজকবি নয়,
এরা সব চণ্ডাল, লিমনের ভাই;
রাজাকে জানিও– একদিন এরাই সব রূপকথা লিখবে ।

## হর-পার্বতী সমাচার

এবার পালক খসাও, স্বর্ণময়ূর– রুদ্র নাচের ঢঙে তোমাকে ভীষণ লাগে– ঝড়ের বার্তা নিয়ে কী এত ভাব? ওই দেখো জ্বলন্ত ঈশান– মৃদঙ্গ-মেঘের মেয়েরা প্রতিশ্রুত আছে– তারা আজ বাজাবে নূপুর–

যাক প্রলয়-লুপ্ত দিন– উঠে এসো কৈলাস বেয়ে– নটরাজ– এদিকে সমুদ্রও ডাকে– হাঁসুলি চঁদের ছায়া দেখা দিল না কি নাভির গণ্ডুষে? আনো তবে বিষতীর, বিদ্ধ করো– সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে দাও বিষের কল্যাণ–

এল মুদ্রাহরণের কাল– পাহাড় আর সমুদ্রের মাঝে সমভূমি, পপি-উপত্যকা– বিজলি চমকের ফাঁকে চেয়ে দেখো, এই আমি কী সুন্দর পার্বতী সেজেছি–

নটরাজ, আনো তবে প্রবল প্রলয়–

## বালিকামৌসুম

নিভৃত পদ্মপুকুর আর জলঢোঁড়া সাপের বন্ধুতা– এই ছাড়া কী থাকে সবুজ বালিকার– আমি তবু লালঠোঁট টিয়ের মতো বুকের গভীরে পুষে রাখি ভিনগ্রহপ্রেম। কেননা ঠিকানা হারিয়ে ফেলা আগুনের সরোবর খুঁজতে আসা যে যুবক বলেছিল– বেঁচে আছি এক খণ্ড পোড়া কাঠের যন্ত্রণা নিয়ে– সে থাকে নেপচুন অথবা ইউরেনাসে– আর খসে পড়া আলোর চিঠিগুলো হাওয়ার পিয়নের কাছে পৌঁছে দেয় সিনীবালী রাতে–

সেই যুবকের দিকে একবার চেয়ে ফিরিয়ে নিয়েছি চোখ– আজ তাই ইজেলের সামনে দাঁড়িয়ে– ক্যানভাসে আঁচড় কেটে দেখি, ভুলে গেছি তার মুখ আঁকা– অথচ সেইদিন একটি বন্ধ্যা যুগ মরে গিয়েছিল– আর তার মৃতদেহ থেকে বেরিয়ে আসা লালের সংকেতে জেনেছিলাম– আমি– ভিনগ্রহচারী– রক্তজবা-ফোটা আমারও রয়েছে এক আশ্চর্য মৌসুম–

তাই রোজ, নিজেকে বিম্বিত করি পদ্মপুকুরের জলে– নিজেরই নিটোল ত্বক– বাহু– নিতম্ব নাভি– স্তনের দিকে চেয়ে মুঠো মুঠো বিস্ময় কুড়াই– মাংসের সৌষ্ঠব ছাড়া ধাতুর চিহ্নমাত্র নেই– তবু আমাকেই টানে কেন অলীক চুম্বক?

আমার কিউরিওসিটি– কল্পযানে চড়ে পৃথিবীর প্রেম নিয়ে প্লুটোর প্রেমিকের কাছে যাই– আর দেখি– আমি– অসহায় দেবযানী– প্রিয় কচের কাছে হারিয়ে যাওয়া আগুনের হ্রদ ফিরিয়ে দিতে গিয়ে নিজেই কখন একখণ্ড চুম্বক হয়ে গেছি!

## চাঁদশিকারি

বাগানের পেছন জলা। তার নিচে পড়ে আছে চাঁদ। যেন ঢেঁকির মুষলে লেগে ভেঙে যাওয়া আধখানা সাদা চুড়ি। আমি যাই, বড়শিতে মন্দারের ফুল গেঁথে চাঁদটাকে তুলে আনি ডাঙায়।
বজ্রপতনের রাত শেষ হলে তাকে আমি নিজ হাতে আবার আকাশে উড়িয়ে দেব।

তা লা শ  তা লু ক দা র

## রক্তজব্দ

একটা চকরাবকরা বল মনের ভেতরে গড়িয়ে গেল
লন্ড্রিতে গেলে যেমত একটা কাপড় উলুকভুলুক হয়ে যায়
তেমত আমরাও ওই মেশিনের রং ব্যবহারে শরীরের আয়রন বের হয়
ফলত, শরীর ক্রমশই স্যাঁকস্যাঁকে হয়ে ওঠে।

তবু ঝামা ইট দিয়ে জোছনাকে ঘষে যাই
বুদবুদযন্ত্রে কয়েকটি জলগাছ বেড়ে উঠতে থাকলে
পিঁপড়েগুলোকে দেখি গাছের কোমর ধরে সরসর করে নেমে যেতে
মূল্য হিসেবে আমার সেদ্ধ করা ডালপালা
দেখো কোয়েলের মাংস হয়ে অনন্ত পেটের সাগরে ভাসছে।

## স্মৃতিব্রীজ

তোমার ছায়াগুলো বাড়ির চতুষ্পাশে ন্যাকড়ার মতো পড়ে থাকে–
জিজ্ঞাসিলে দেখি, তার গায়ে লেগে আছে ক্বাথ;
যাকে ঝেড়ে ফেলতে ঝড়গুলোর সাথে গাছপালা হস্তনির মতো লড়ছে–
সেই থেকে আলোর নেশা করতে পোকামাকড়গুলো
প্রত্যহ ঝাঁপিয়ে পড়ে সোডিয়াম বাল্বের উপর ।
শেষে, প্রাণ দাহ্য করে, চিরে নানারকম হতাশা বের করে আনে ।
আর জেনো, হতাশারা হ্যাগড়া– লুসোপাঙ্গোর মতো
বসে থেকে থেকে জীবনের ছোট ছোট তারার আলোকে
দেখেছি আয়েশি ভঙ্গিমায় গিলে খেতে ।

তুমি কি দাড়িওয়ালা?– যে তোমার গালে অহেতুকই চুল ঝুলবে?

কবিতা

## দ্বি তী য় দ শ ক

মা মু ন অ র র শী দ

## বিশুদ্ধ অগ্নির সারসেরা

কামারের কাছে ছুটি পেলে বিশুদ্ধ অগ্নির সারসেরা সূর্যে মিশে যায় ।
এ-শহরে
হাওয়ার আপেলে কামড় না-দেয়া যুবকেরা কেঁদে থাকে, গোলাপ-হাতে ইতস্তত
প্রেমিকেরা দীর্ঘদিন মূক ছিল

আর আমিষ-অরণ্য ও নোনতা-হ্রদের যারা পর্যটক, পৌরকর্তারা
দু'তিনটি ঝাঁকুনি দিয়ে হাঁটুব্যথা বা শীতের দোহাই দিয়ে
বালিশে মুখ ওপাশ করে ঘুমিয়ে পড়েছিল ।
সকালে সূর্য উঠলে সব্বাই, সেদিন জড়ো হয়েছিল জানালার পাশে ।
মৃত মেয়েটির মুখ তবুও চাদরে ঢাকা ছিল । সাদা সারসের চাদর ।

কেউ বলেছিল,
এ তো ধবল রোগের কাম । না না, মেয়েটির এমনিতে অসুখ ছিল । এই মোবাইলেই
যত সর্বনাশ । ওরা ক'জন ছিল? এ্যাই জানালা বন্ধ করে দ্যান ।

কামারও কয়েকদিন জ্বরে আক্রান্ত । বিশুদ্ধ অগ্নির সারসেরা এখনও জন্মাতে পারেনি ।
শোনা গেছে, কামার ডাক্তার দেখাতে যাবে ।
১৭ ০১ ২০১৩

## গনি মিয়া একজন দরিদ্র কৃষক

গনি মিয়া একজন দরিদ্র কৃষক । তাহার নিজের কোনো জমি নাই ।
সে অন্যের জমি চাষ করে । তাহার তিনটি কন্যা একটি পুত্র
রহিয়াছে । গনি মিয়া গরিব হইলেও সৎ কারণ সে গ্রামীণ ব্যাংকের
কিস্তি ঠিকমতো পরিশোধ করিয়া থাকে । গ্রামীণ ব্যাংক তাহাকে
নতুন জীবন দিয়াছে । তাহার তিনটি কন্যা-সন্তানের অধীনে নয়টি
ব্ল্যাকবেঙ্গল ছাগল রহিয়াছে । সে-এক বিরাট কারবার ।
সেদিন হাটবার, ঢাকা হইতে কৃষকদের জ্ঞানী-গুণী পরিশ্রমী শাইখ
সিরাজ সাহেব এসে বলিয়াছেন যে, ব্ল্যাকবেঙ্গল ছাগলে অধিক
মুনাফা অর্জন করা সম্ভব । তাহার সাথে ভিডিও ক্যামেরা
আসিয়াছিল, সেখানে গনি মিয়ার ফটোগ্রাফ তোলা হইয়াছে । প্রথম
বার গনি মিয়া ভুল করিয়াছিলেন । তাহার মুখে হাসি ছিল না ।
দ্বিতীয় বার নয়টি ছাগলের মধ্যমণি হইয়া গনি মিয়ার ছবি তোলা
হইয়াছে । ঢাকা হইতে মীনাবাজারের কোম্পানির বড় সাহেবগণ
আসিয়াছিলেন । তাহারা গনি মিয়ার সাথে আগাম চুক্তি করিয়াছেন,
গনি মিয়ার ছাগলের সংখ্যা নয়শত হইলে মীনাবাজারে ছাগলের

মাংস রপ্তানি করা হইবে । ঢাকা হইতে উন্নত মানের সার আর
ধানের বীজ  নিয়া ব্রাক কোম্পানির বড় সাহেবগণও
আসিয়াছিলেন ।

গনি মিয়া আর দরিদ্র নাই । গনি মিয়া ধনীও হইতে পারে নাই ।

## প হে লী  দে

## অন্তর্গত যাত্রা

নিদারুণ দুঃসময়ের দক্ষিণ হস্তকে আশ্রয় করে
আমরা ছুটে যেতে চাইছি কবিতার দিকে ।
তোমার ডান চোখে আমি বাম দৃষ্টির ছায়া
ফেলতে ফেলতে চৌরাস্তার উদাসী বুকে,
মানুষের ঢেউয়ে রক্তলেখা মানচিত্র খুঁজে
অস্ত যায় দুরারোগ্য রোদের কোলাহলে ।
মধ্যবিত্ত বিছানার প্রত্যন্ত দেয়ালে হেলান
দিয়ে দাঁড়িয়েছিল আমার আয়না ঘুড়িটি,
চলতে ফিরতে যার অতলে আবক্ষ আমি
প্রতিবিম্বিত হতাম সাঁতারু পাখিটির মতো ।

এবং জীবনের একমাত্র সঞ্চয় ভালোবাসাকে
আগলে রাখতো সে আলোর নৈঃশব্দ্যে
আর সমুদ্র পৃষ্ঠার রুপালি সৈকতে
আমি হতাম শব্দবতী ঝিনুক অথবা নুড়ি ।

এক সন্ধ্যার বাতাবী আয়োজনে
হঠাৎ নিভে গেলে ঝাউবনে জ্বলে ওঠা জোনাকি দীপ
ভেঙে গেল সেই একরত্তি আয়নার নিরালা নীড়,

সমস্ত দেয়াল জুড়ে শুধু শূন্যতার পাহাড় জমে

অন্তর্গত আয়নার বিরহে আমার উঠোন
তলিয়ে গেছে অজস্র কাচের ভঙ্গুরতায় ।
তাই এখন আমার আর নিজেকে দেখার
নাম করে তোমাকে দেখা হয় না ।

## পাথর সময়

পাথর যাত্রা শেষে মমতাময়ী শীতল পার্টি
মুছে দেবে বুকের খরা,
তাই আমি অলি-গলি, রাজপথে
ফেলে আসা পায়ের ছাপ দত্তক দিলাম
স্নেহবিলাসী শুকনো পাতাটির উমে ।

সূর্যের প্রাতরশ্মিকে প্রদক্ষিণ করে চলতি পথে
দু'বার মাত্র পেছনে মুখ ঘুরিয়েছিলাম,
"একদৃষ্টির সরলতরঙ্গে নোনাজলের জোয়ার
ছাপিয়ে চোখের দর্পণে দর্পিত হলো মা ।

শিউলির শুভ্র আলোয় লিখে রাখা শৈশব
কয়েক টুকরো স্মৃতির শৈবাল হাতে দাঁড়িয়েছিল
নীলনবঘন শরতের উপকণ্ঠে বাষ্পের স্বপ্ন এঁকে ।"

তারপর আর কোনো পিছুটানে থামেনি
রোদের উজান
হাওয়ার বৈপরীত্য মেনে নিয়ে শূন্য ডিঙি
কেবল বয়ে চলেছে দুর্মর সময়ের দিকে ।

# চোখের আলোয়

চোখ নিভে গেলে
শোল মাছের পোনার মতো
কবিতারা ঝাঁকে ঝাঁকে
ভাবনার নদী জুড়ে কলবল করে ।
তাই আমি প্রভাতী সূর্যের মুখ দেখিনি
হলুদ পাতার শহরে পিচঢালা পথের ভিড়ে
ফুরিয়ে যেতে যেতেও ফুরোয়নি ।
কবিতারা বহুবার আমার ভাঙন ঠেকিয়েছে
বন্ধ্যা সময়ের থাবা হতে ।
ভালোবেসে নিজের করে নিয়েছে তাবৎ দীর্ঘশ্বাস ।

রাতের স্তনে ওরা যখন এক্কাদোক্কা খেলে
আমার মুগ্ধতাকে ছাপিয়ে যায়
আমি তখন ওদের লাল নীল শব্দফুলে
সাজিয়ে রাখি খেয়ালখুশির একাকিত্ব ।
হাজারো না-পাওয়া কষ্টগুলো
কানামাছি খেলায় মেতে
প্রেমিক তুলিতে আঁকে কাব্যলক্ষীর উর্বশী শরীর ।
একপাটি ঘর, ঝুলবারান্দা এবং ঘরমাতানো
বাবুইসোনা স্বপ্নটি শানিয়ে নিয়ে
কবিতার হাত ধরে নিশুতি ছায়ার মুখোমুখি হই
নদীমাতৃক তুমি আমি ।

# পুঁজিবাদী স্বপ্ন

গোধূলির হাত ধরে নাগরিক কুয়াশা সরিয়ে
তোমার দিকে অগ্রসরমান নদী ।
চলমান সড়কের দু'পাশে এবং
মধ্যখানে গুটিগুটি বৃক্ষশিশুর নাতিদীর্ঘ ছায়ায়
হাড়জুড়ানো ধুলোময় নামমাত্র মানুষ,
দালান সভ্যতার পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্টে জর্জরিত ভাগাড়,
নগর পক্ষীর কর্কশ কোলাহল ও
মৌসুমি শাকসব্জির পসরা পেরিয়ে
ছুটে গেলাম প্রিয়তর জলের জ্বলন্ত জঙ্গলে ।

তোমার কোলে লালিত স্নেহে দোল খেতে খেতে
আমার ভাবনার ঝুলন্ত করিডোরে
এতকাল শিষ দিয়ে যেত যে পায়রা,
তোমার চোখে চোখ খুলতেই সে হয়ে গেল
বাবুদের রঙ্গালয়ে বন্দি খাঁচার পাখিটি ।
যার কাছে দু'বেলা নিয়ম করে আকাশের গল্প করতাম,
মানচিত্র হতে খুঁজে খুঁজে ম্যানগ্রোভ সীমানা শিখিয়ে
স্বাধীনতা আহরণের সুদীর্ঘশ্বাস ওর পাখায় গেঁথে দিতাম ।
আমার গল্প শুনতে শুনতে তার বলাকা পাখা
শ্যামল শীতলক্ষা নীর ছোঁয়ার ছটফটানিতে
ভেঙে দিতে চাইত পরিপাটি খাঁচার দেয়াল ।

আজ উজান সন্ধ্যামুখী হয়ে আমরা দাঁড়ালাম
আকাশ মাটি জলের ত্রিভুজ সঙ্গমে ।
তোমার জলজ বুকের অথৈ লাবণ্য
গোগ্রাসে গিলে খাচ্ছে পুঁজিবাদী নৌকাজাহাজ
এবং আমি ও পায়রা হয়ে গেলাম
সৃষ্টিশীল অশ্লীল সভ্যতার নীরব দর্শক ।

## স্পর্শক

যদি একবার এ হাতের একটি স্পর্শকে
দুর্বার বুক জ্বালিয়ে রাখা শিশিরের মতো
ও দেহ-মনে, ওষ্ঠে-অধরে মেখে নিতে পার
তাহলে বুঝবে জলমগ্ন ধরণীর জলাঞ্জলে
মিশে যেতে যেতে পূর্ণবতী শশীর কত ষোলকলা
নিভে গেল দুঃখবতী ভালোবাসার দুর্বিনীত আঙিনায় ।

তুমি শুধু আভূমি রাতের উরুতে জোছনার পাহাড়
জমতে দেখেছ
অমাবস্যার অনুপম নাভিতে ঝাঁপ দেয়া
উল্কাবধূর আত্মহনন দেখনি ।
যদি ভ্রূণাক্ষরেও একবার তোমার দৃষ্টিতে
নিক্ষিপ্ত হত সেই অমরত্ব
তবে এই পথ্যগুলি আঁকড়ে থাকা
দুঃখগুলো হয়ে যেত পাঁচটি জলাভূমি ।

পরিত্যক্ত জলাশয়ের আদরেও
কচুরি সুন্দর যেমন প্রস্ফুটিত হয়
তেমনি বিস্রস্ত স্পর্শগুলো ফুটতে
নির্ঘুম অরণ্যের ক্ষেপা সবুজে ।

চা মে লী ব সু

## বিরান মুখের মায়া

আধফোটা কচুরিফুলের বিভায় খুঁজি তার বিগত দিনের মুখ; যে মুখ একদিন মা আমনধানের সবুজ মায়া ভেবে তুলে এনেছিল তার কলা– কচু- হলুদের দাগে ভরা আঁচলে বেঁধে– সাথে কিছু মসনে– মটর– রাই– শস্য– মুসুরির ঘ্রাণ...

আমার দু'হাত যেন প্রকাণ্ড আকাশ–
হা্ওয়াদের যে মেয়েটি বেণি দুলিয়ে নেমে আসে ফুলের রেণুর মতো চৈতালি মাঠের আইলে– আকাশ আকাশ হাতে ছুঁয়ে দেই তার গমের দানার মতো সোনালি শরীর

কানো এক সামাজিকতার দায় থেকে পাপ আর পুণ্যের ভাঁড়ারের চাবি বেঁধে দিলে তার কঠিন ফাটা ধুলো-পড়া পায় সে হয় চৈতালি ফসলের দেবী আমি তবু খুঁজে ফিরি গোধূলি নিরেট চোখে মায়ের আঁচলে বাঁধা আমনধানের সবুজ মায়া ।

অন্তরগত ভালোবাসা – যার কোনো ডাকনাম নেই

আমি তাকে ভালোবেসে জমিয়ে রাখি লাল-নীল টিপের পাশে...অথবা মাঝে মাঝে কিছু ব্যক্তিগত হুকের কার্নিশে যদিও সে চোখে আঙুলের বদলে সুরমা দিয়ে বলেছিল– আমরা একদিন রুমালের ভাঁজে বসবাস করবো অথবা আধ-ছেঁড়া পলিব্যাগে চড়ে উড়ে যাব হাওয়ার উদ্দেশ্যে...আর একদিন চার আনা স্বপ্ন হাতে দিয়ে বলেছিল–

মেঘেদের মেয়েদের গা থেকে যেমন জল জল গন্ধ আসে তেমনি তোমারও– তুলোতুলো ভাবনা মাথায় একে সাবলীল হেসে আমি হয়ে যাই মেঘ সে হয় পথভুলো বুনো হাঁস–আমরা ছাড়িয়ে যেতে থাকি আমাদের নিজস্ব চেনা গণ্ডী এবং গণ্ডীর মতোন কিছু ছলনার দাগ–
তারপর একদিন সে দেয় পাড়ি আরও দীর্ঘ ভুল পথ; আর আমি, জল হয়ে ঝরে পরি সোমেশ্বর নদীটির বুকের ক্ষতে

তোমাকে বিবর্তিত হতে মানা

মোমের মতো শাদা পা ফেলে তুমি চলে যেতে চা্ও নীল নীল অপরাজিতার বনে

অথচ তুমিই একসময় ছেঁড়া কাগজে ভর দিয়ে দাঁড়াতে চেয়েছিলে শহরের ফুটপাত জুড়ে;
কিংবা দুই চোখে দুই রঙের স্বপ্ন বুনে বুনে
বেতের কাঁটার মতো আঁকড়ে ধরেছিলে অন্ধকারের হাত
অথবা খুব সাধ্যি-সাধনায় তুমি হয়ে যেতে পেরেছিলে চতুর শহরের চিলেকোঠায় জ্বলা নিয়নবাতি আর তোমার পেটের ক্ষুধাকে মঞ্চ বানিয়ে নেচে গেলে কিছু উদম পায়রা

তুমি ভাব লক্ষ্মীপেঁচা বুঝি এসেছে নিয়ে ডানা ভরে অগাধ জোছ্না ... 'বিক্রিত মাংস ফেরত নেয়া হয় না'– এ-জাতীয় বিলবোর্ডের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে তবু তুমি চলে যেতে চাও নীল নীল অপরাজিতার বনে !

অ র বি ন্দ  চ ক্র ব র্তী

## মধ্যরাতের মস্করা:০১

শরীর দেখা হলো । এবার সতর্ক করে নিই ।

পা ফস্কে গেলে, মনে করা যাক– আমাদের গাছে উঠবার অভ্যেস ছিল ।

প্রতিদিন সবার পাশে  কৌতুকপ্রবণ রাত্রি আসে । অথবা তোমাকে কোনোদিন পেতে হবে–
এই বানোয়াট সান্ত্বনায় কোলবালিশের সত্যে রাতে গুঁড়ো গুঁড়ো ঘুমের তামাশা ।

যদি বলি ভয় পেলে আরোহীগণ, স্বপ্ন তাড়ানোর ছলে ঘুম কেন তাড়ান? ভোররাতে দরজায় রোদ ওঠাবার নামে থার্মোমিটারবিহীন যার যার গায়ে কেন বাছেন জ্বরের উকুন ।

লোকটা পালাতে চাইবে । অথচ সাহস করে জানতে চাইবে না
টিকটিকি ছুঁলে লেজ  কেন ঝরে যায়!

## মধ্যরাতের মস্করা:০২

যেহেতু পথে আছো । দেখা হয়ে যাবে একজন রেলক্রসিংয়ের । কালো রেখাটিই যদি তোমাকে
বলে ফেলে অধিপতি । খামোখাই একবার তাকে পাগল বলবার অধিকার নিও ।

পাতার আড়াল থেকে বৃত্ত–চাঁদ যাকে অধঃপতন ডাকে । দেখি তাকে টমেটোর মতো গোল ।
গড়াতে শুরু করলে পিছু নেয় ভুতুড়ে সব আলোবাজের লালসা নিয়ে ।

তো আমার জন্য তুলে রেখো অন্ধ বাবুইয়ের গান । রেকর্ডপ্লে য়ারে অহেতুক বাজাবো
অবসর পেয়ে ফড়িংকে তুমি যে ক'বার বলেছিলে
নিজেকে মত্ত পালোয়ান ভাবার রূপকথা ।

আজ মেঘ করছে, রাক্ষস আসবে পাশের ফ্ল্যাটে
আকাশপথ নিয়ে তাজা পা নকল নিবন্ধ লিখবে ।

কথা দিচ্ছি, আজ মহাকাশদস্যুর দেখা পেলে তিনবার শিস বাজিয়ে
তাকে বেহুঁশ করবার প্রেস ব্রিফিং আমি করবোই ।

## মধ্যরাতের মস্করা:০৩

ধুয়ে ফেলো । রাজহাঁস মাস পেরিয়ে আঁচ পাক জলের উদ্যোগ পুকুরেও থাকে ।
উদ্ভ্রান্ত জলচর তলদেশ থেকে তুলে আনুক সাইবেরিয়া মানে বছরজুড়ে একটিই ঋতু ।

খুব কাঁপুনি এলে মেয়েটির শেমিজ ভিজে যায়
আজ বিকেলে যে তুখোড় বৃষ্টি হলো, তাহলে বলুন, এ কার দায়?

বেঁচে থাকলে প্রতিদিন ভাবতে হয় ধেয়ে আসছে গেল ঋতুর উপসংহার ।
সারমর্ম করে একজন প্রায় সন্ধ্যায় আমাকে কানেমুখে করে যায়,
তাপসীদেরও নাকি সারা বছরে একটিই ঋতু ।

বাবা টিনএজ, মধ্যরাতে জ্বর এলে তুমিও স্মরণে রেখো পাশবালিশ নিয়ে
বিছানায় গেলে সেও বোবা যন্ত্রণার বেলেহাঁস হতে হয় ।

## মধ্যরাতের মস্করা:০৪

দুঃখ পাওয়ার জন্য ভাষা গবেষকের প্রয়োজন হবে না ।
তেলাপোকা যে দুর্ধর্ষ দস্যুতা শোনাবে তা থেকে হাতির ঝিল যেতে যে সরলরেখা
ড্রাইভিং লাইসেন্স না পেয়ে পর্যটনের দিকে চলে গেছে তার একটি চাকার গল্পই
যথেষ্ট ।

আজ বন্ধুর মেয়ের সঙ্গে চা খেতে খেতে
আবাসিক আমাকে ডাকলো–সায় দিই নি বলে
শহরের সড়কে সড়কে নেমে গেল ফায়ারস্কোয়াডের গাড়ি ।

বটপাতা জানে না আমি প্রজাপতি চিনি না
যাকে চিনি সে তার মৃত্যুদিবস অবমাননাকারী ।
আর দুপুররাতে গুহাচিত্র খুঁড়ে গুঁড়োগুঁড়ো ফুলস্টপ লিখতে দুর্দান্ত মেধাবী ।

মে হে রু বা নি শা

## আঙুরলতার বনে

বন থেকে ফেরার পথে সমুদ্রের আহ্বান-
কে যাবে জোয়ারে এই ফসল তোলার দিনে!
নীল প্রপাতের নিচে
নাচে নগ্ন শিশুর দল;
যারা পাহাড় পেরোতে চায়–
যারা সাগর এড়িয়ে যায়–
তারাই ওড়াবে একদিন নির্ভরতার ঘুড়ি,
সুতো কেটে সেই ঘুড়ি উড়তে উড়তে যাবে
আঙুরলতার বনে–

যে বনে এখনো মৃত ঈগলের ঘ্রাণ,
সে বনেই আজ বেড়ে ওঠার প্রশ্রয়ে
ফেটে ফেটে যায় ফল– গড়িয়ে পড়ে রস–
না জানি কী মধু– না জানি কী মদ–
কি জানি কী চূর্ণ বেদনায়–
কি জানি কী দীর্ণ আলিঙ্গনে...
এইবার– এই ফসল তোলার দিনে
কে এড়াবে আর সুদূরে কেওড়ার ঝাঁঝালো আমন্ত্রণ!

## চমকাবো না তবু নিদ্রাঘোরে

ওরে পুচ্ছ নাচায় কে সে বৃদ্ধ ময়ূর যেন দূর পাহাড়ে,
আমি টপকাবো না তবু ক্রুদ্ধ পাহাড়– দূরে অন্ধগহীন– ঝোপে জমকালো বন ভরা
পুষ্প-শাখা ঘন বৃক্ষরাজি,
আমি এইতো আছি ভালো সর্পজীবন
যেন নিদ্রাকাতর হয়ে শীতঘুমে যাই...
জেগে চমকে তাকাই– দেখি জাপটে আছে তনু দৃপ্ত ময়াল
ওরে সঙ্গী আমার! একি কম্পনেরে আমি উঠছি জেগে যেন সুপ্ত রাগে!
একি তুচ্ছ আগুন! কেন গুচ্ছ পাতা পোড়ে বক্ষতলে!
দূরে ক্রুদ্ধ পাহাড় যেন উঠছে দুলে...
ওরে পুচ্ছ নাচা জোরে বৃদ্ধ ময়ূর
আমি চমকাবো না তবু নিদ্রাঘোরে...

## নীল ঘোড়া

রোমন্থনে ব্যস্ত  ছিল নীল ঘোড়াটা ।
লাল ঘোটকীর পায়ের তলায়
আগুন দেখে চমকে গেল!

হাতের মুঠোয় ফুজিয়ামা-ও
কাতর ছিল!

সমুদ্রজল ফেনিল হয়ে যাচ্ছে উড়ে; মেঘের দলে...

ঠিক তখনি, নীল ঘোড়াটার খুরের আঘাত
লাল ঘোটকীর উরুর তিলও কাঁপিয়ে দিল!

অসভ্য ঐ নীল ঘোড়াটাই উস্‌কে দিল সভ্যতাকে!

## অভিগ্রস্ত

তোমার গালে ঠোঁট রেখেছে ক্লান্ত সারস;
পুকুর জুড়ে বিষণ্নতা–
মাছের লেজে অভিজ্ঞতার লুটোপুটি–
ক্লান্ত চোখে একটুখানি চেয়ে থাকার যোগ্যতা নেই; বুঝতে পারি ।
জলের ভেতর ডুবতে গিয়ে পেঁচিয়ে গেছি তোমার গায়ে
তুমিই কি সেই চন্দ্রবোড়া– খুঁজতে থাকি!
রক্তে আমার বিষ ঢেলে দাও কঠিনতর কোমলতায়–
তোমার বিষে রক্ত ঢেলেই মন ফেরাবো আরাধনায় ।

প্র ব ন্ধ

# অরিয়েন্টালিজম

.....

ফ য়ে জ আ ল ম

গত শতকের অস্থির, দ্রুত পরিবর্তনমুখী বুদ্ধিবৃত্তিক আবহে এডওয়ার্ড সাঈদ ছিলেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টিশীল চিন্তাবিদদের একজন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, বিশেষত ষাট ও সত্তরের দশকে সকল ধরনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের কাছে আনত অসম্ভব একটা মানব-বিশ্বে সাঈদের আবির্ভাব প্রচণ্ড আলোড়নের মতো, যা নাড়িয়ে দেয় পশ্চিমের সাংস্কৃতিক আধিপত্য ও দমনের দীর্ঘ, স্থিতিশীল আয়োজন–উন্নত বিশ্বেও সাংস্কৃতিক প্রভাবনের সূত্রে অর্জিত ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মূল-ভিত্তির কৃত্রিম গ্রন্থিগুলো খুলে খুলে দেখায় এবং এভাবে অনুন্নত অঞ্চলগুলোর, বিশেষ করে প্রাক্তন উপনিবেশিত দেশসমূহের মানুষদের চিন্তাভঙ্গির দীর্ঘকালীন উপনিবেশিক-অনুবর্তনের মধ্যে সূচিত করে অবমুক্তি ও বিকাশের তীব্র সম্ভাবনা। সাহিত্যের ছাত্র ও অধ্যাপক হয়েও আর্থ-রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সকল কর্তৃত্বকেই তিনি চিহ্নিত করেন, বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে আক্রমণ করেন, তার স্বরূপ উন্মোচন করে দেখান।

সমকালে আধুনিক মনোভাবের ধীর কিন্তু নিশ্চিত বিলুপ্তি এবং নতুন চিন্তাভঙ্গির বিচিত্র উৎসারণে যে প্রশ্নময়তা, সন্দেহ, অবিশ্বাস ও অনিশ্চিত অনুসন্ধান শুরু হয় সাঈদ তার মধ্যে কিছুটা ভিন্ন এক পথে যাত্রা শুরু করেন; সংস্কৃতি-সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতি, আধিপত্য, ক্ষমতা এবং অনুন্নত বিশ্বের মানুষের মনোজগতে তার প্রভাব ও পরিণতি হয়ে ওঠে তাঁর পরীক্ষণ-পর্যবেক্ষণের বিষয়। এভাবেই তিনি চিহ্নিত করেন প্রাচ্যতত্ত্বের গূঢ়-গোপন সংগঠন যাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ধর্ম-যাজকের মন্ত্রপাঠ থেকে শুরু করে রুশোর রাজনৈতিক তত্ত্ব কিংবা জেন অস্টিনের উপন্যাস; এর লক্ষ্য হল প্রাচ্যের মানুষদের মনোজগৎকে বশে রেখে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা ও তা অক্ষুণ্ন রাখতে সহায়তা করা। এ ধরনের আত্মমুখী অন্বেষা আধুনিকতা-উত্তর চিন্তাধারায় সাঈদকে প্রতিষ্ঠিত করে অনন্য অবস্থানে। উপনিবেশিক শক্তিসংঘের জটিল কাঠামো ও তার কর্ম-প্রক্রিয়া উন্মোচন এবং উত্তর-উপনিবেশ-কালে উপনিবেশিক যুগের সাংস্কৃতিক প্রভাবন ঝেড়ে ফেলার প্রক্রিয়া সম্পর্কে সাঈদের এই বিশ্লেষণই ক্রমে উত্তর-উপনিবেশবাদ রূপে সুসংঘটিত ও পরিচিত হয়।

সাঈদের জন্ম ১৯৩৫ সালে, ফিলিস্তিনের জেরুজালেমে এক এপিসকোপ্যালিয়ান খ্রিস্টান পরিবারে। ইসরাইল প্রতিষ্ঠার পর উদ্বাস্তুর নিয়তি মেনে কিশোর বয়সে পরিবারের সাথে মিশরে পাড়ি জমান। কিছুকাল কায়রোর ভিক্টোরিয়া কলেজে পড়ে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। ওখানে মাউন্ট হারমান স্কুল, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি এবং হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে পাঠ শেষে ১৯৬৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ওখানেই আজীবন ইংরেজি ও তুলনামূলক সাহিত্য পড়িয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইংল্যান্ডের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসরের দায়িত্বও পালন করেন।

ফিলিস্তিনি মুক্তি আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন সাঈদ। ১৯৭৭ সালে প্রবাসী ফিলিস্তিন পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হয়ে প্রায় ১৪ বছর ধরে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯১ সালে ইসরাইল-ফিলিস্তিন চুক্তি সংক্রান্ত মতবিরোধে পদত্যাগ করেন তিনি। এক পুত্র ও এক কন্যাসন্তানের পিতা সাঈদ প্রায় এক যুগ ধরে ব্লাড ক্যান্সারে ভুগছিলেন। গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৩ খ্রি. আমেরিকার এক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন এই মহান মানুষটি।

## দুই.

*অরিয়েন্টালিজম* সাঈদের অন্যতম গুরত্বপূর্ণ, সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ১৯৭৮ সালে এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ত্রিশটিরও অধিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এই একটিমাত্র গ্রন্থের জন্যেও সাঈদ অমর হয়ে থাকতেন। এখন পর্যন্ত এ গ্রন্থটি মানববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তার গভীরতর প্রভাব অব্যাহত রেখেছে। এ গ্রন্থে সাঈদ অঙ্গীকার করেন মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোয় ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর রাজনৈতিক, সামাজিক, নৃ-তাত্ত্বিক, আর্থিক আধিপত্যের সাংস্কৃতিক প্রস্তুতি ও প্রতিফলন–প্রাচ্যের ঐ অঞ্চলের ওপর পশ্চিমের কর্তৃত্ব, কর্তৃত্বের আরোপন, তার উপায় ও ধরনের ইতিহাস রচনার।

ঐ কর্তৃত্বের বা আধিপত্যের পেছনে কার্যকর সাংস্কৃতিক মনোভঙ্গি ব্যাখ্যা করার জন্যে সাঈদ ব্যবহার করেন *অরিয়েন্টালিজম* বা *'প্রাচ্যতত্ত্ব'* পরিভাষাটি। প্রাচ্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সাঈদ বলেন, 'প্রাচ্য হল পশ্চিমের জ্ঞানজগতের নির্মাণ; পশ্চিমের নিকট প্রাচ্য ছিল দূর ও অজানা। সেই দূর ও অজানাকে জানার চেষ্টায় প্রাচ্য হয়ে উঠে পশ্চিমের 'অন্য' বা আদার–পশ্চিমের প্রতিপক্ষ। ফলে পশ্চিম (অর্থাৎ নিজ) হয় ভালো, 'প্রাচ্য' (অন্য) মন্দ। এ 'প্রাচ্য' বাস্তব প্রাচ্য নয়, পশ্চিমের সৃষ্টি মাত্র। পশ্চিম প্রাচ্যে তার উপনিবেশ গড়ার বহুপূর্ব হতেই প্রাচ্যের ইতিহাস, জনগোষ্ঠী, সংস্কৃতি, বিশ্বাস সম্পর্কে অজস্র কাল্পনিক ধারণা সৃষ্টি করেছে, প্রচার করেছে, প্রজন্মক্রমে নিজেরা তা বিশ্বাসও করেছে। সে কল্পনা ও ধারণার মূলে আছে পশ্চিমের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাচ্যের

নিকৃষ্টতার বোধ। আঠারো শতকের শেষ ও উনিশ শতকের শুরুতে এ ধারণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই পশ্চিম প্রাচ্যে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালায়।

পাশ্চাত্যের মানুষেরা উপনিবেশিত প্রাচ্যে এসে বাস্তবতার নিরিখে তাদের সংশোধন না-করে বরং তাকেই জোরদার ও পুনরুৎপাদন করে। বাস্তব প্রাচ্যকে তাদের নির্মিত 'প্রাচ্য' রূপেই দেখে, এমনকি বাস্তবের উপর চাপিয়ে দেয় তাদের কল্পনার প্রাচ্যকে। ফলে এই দূরত্ব আর ঘোচেনি। এভাবে প্রাচ্যকে হেয়করণ, দমন ও শাসন করার সাংস্কৃতিক তৎপরতা ও মনোভাবই হল প্রাচ্যতত্ত্ব। পশ্চিমা জ্ঞানজগতে 'প্রাচ্যতত্ত্ব' নামের এই ডিসকোর্সের পরিশোধিত বক্তব্য হল : (পৃথিবীতে) . . . পশ্চিমের মানুষ আছে, আর আছে প্রাচ্যবাসী। প্রথমোক্তরা আধিপত্য করবে। সেই আধিপত্যের শিকার হতে হবে, অবশ্যই, দ্বিতীয়োক্তদেরকে : যা সচরাচর বোঝায় তারা তাদের ভূমি দখল করে নিতে দেবে, তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে দেবে, তারা তাদের রক্ত ও সম্পদ তুলে দেবে কোনো না-কোনো পশ্চিমা শক্তির হাতে। (*অরিয়েন্টালিজম*, ১৯৯৫, ৩৬)।

প্রাচ্যতত্ত্ব প্রাচ্যকে নিকৃষ্ট মনে করে এবং প্রাচ্যের মানুষদেরকে নিজস্ব শাসনে পরিচালিত হওয়ার অযোগ্য ঘোষণা করে। যেহেতু প্রাচ্য বিনষ্ট, অসভ্য, তাই প্রাচ্যজনকে কথা বলতে দেয়া যায় না। কারণ সে নিজেকেও ভালো করে চেনে না, তাকে যতটা চেনে পশ্চিমের লোকেরা। তাই প্রাচ্যের পক্ষে কথা বলে সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপ–প্রাচ্য পরিণত হয় নিকৃষ্ট, নির্বাক, নিষ্ক্রিয় উপনিবেশে। আঠারো শতকের শেষ থেকে প্রাচ্যতত্ত্বের সক্রিয় যাত্রা শুরু হয়। এখনো তা অব্যাহত রয়েছে–যাবতীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি সমেত, ভিন্নরূপে, নব্য-সাম্রাজ্যবাদের মধ্য দিয়ে।

*অরিয়েন্টালিজম*-এ বিন্যস্ত চিন্তাভাবনার পেছনে সাঈদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার একটা ভূমিকা আছে। তিনি লিখেছেন : এ রচনায় আমার ব্যক্তিগত বিনিয়োগের বেশিরভাগটাই এসেছে দু'টো ব্রিটিশ উপনিবেশে বেড়ে ওঠা শিশু হিসেবে 'অরিয়েন্টাল' হয়ে ওঠার সচেতনতা থেকে। ঐ দুই উপনিবেশ ও যুক্তরাষ্ট্রে আমার সকল পড়াশোনা পশ্চিমা ধাঁচের। এ সত্ত্বেও কম বয়সের ঐ সুগভীর সচেতনতা অক্ষয় রয়ে গেছে। আমার এই অধ্যয়ন অনেক দিক থেকে প্রাচ্য বিষয়রূপী 'আমার' ওপর সেই সংস্কৃতির চিহ্নসমূহের তালিকা প্রণয়নের প্রয়াস, যে সংস্কৃতির আধিপত্য সকল প্রাচ্যবাসীর জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এ কারণে আমার বেলায় মনোযোগের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে ইসলামি প্রাচ্য (*অরিয়েন্টালিজম*, ১৯৯৫, ২৫)।

*অরিয়েন্টালিজম* এমন এক রচনা যা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ক চিন্তার প্রেক্ষিত ও অভিমুখ চিরতরে পাল্টে দিয়েছে, অন্যদিকে, তার স্রষ্টাকে পরিণত করেছে কিংবদন্তিতুল্য মানুষে। পশ্চিমের আধিপত্যবাদী জ্ঞান ও সংস্কৃতি যখন সারা পৃথিবীতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত তখন *অরিয়েন্টালিজম* এক ধীরগতির বিস্ফোরণ, যা আক্রান্ত করেছে সেই আধিপত্যের মূল প্রক্রিয়া ও কৌশলসমূহকে।

ইউরোপ ও আমেরিকার শক্তি প্রাচ্যের ওপর সামরিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য চালানোর সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে প্রাচ্যের মানুষের মন, আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি ও সাংস্কৃতিক স্বভাবের ওপরও আধিপত্য করেছে, নিজেদের ইচ্ছেমতো রূপান্তরিত, বিকৃত ও পরিবর্তন করেছে তাদের মনোজগৎ ও বাইরের ইমেজকে তা জানার জন্যে *অরিয়েন্টালিজম*-এর বিকল্প নেই। সাঈদের দৃঢ় যুক্তিসহ বক্তব্য, তীক্ষ্ণ ও নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ, ক্ষমতা ও সংস্কৃতির সম্পর্ককে যথাযথভাবে শনাক্তকরণের সক্ষমতা *অরিয়েন্টালিজম*-কে পরিণত করেছে আধিপত্য ও সংস্কৃতির তাত্ত্বিক আলোচনার *'অনিবার্য আদর্শ'*-এ।

## তিন.

বিশ শতকে আধিপত্যের রাজনীতির সর্বগ্রাসী ছায়ায় আড়ষ্ট পৃথিবীতে বহুদিক-গামী বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা করেছেন সাঈদ। একাধারে সাহিত্য-সমালোচনা, সংস্কৃতি, সমাজতন্ত্র, সঙ্গীত, রাজনীতি– এ সমস্ত বিষয়েই লিখেছেন। কুড়িটিরও বেশি প্রকাশিত গ্রন্থে অভিব্যক্ত তাঁর ভাবনায় ক্ষমতা ও আধিপত্যের নানা দিকের প্রতিভাস মেলে। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো হল : *জোসেফ কনরাড অ্যান্ড দি ফিকশান অব অটোবায়োগ্রাফি; বিগিনিংস: ইনটেনশন অ্যান্ড মেথডস; অরিয়েন্টালিজম; রিএ্যাকশন অ্যান্ড কাউন্টার রেভ্যুলিউশন ইন দি কনটেমপরারি আরব ওয়ার্ল্ড; দি কোশ্চেন অব প্যালেস্টাইন; লিটারেচার অ্যান্ড দি সোসাইটি; কভারিং ইসলাম; দি ওয়ার্ল্ড, দি টেক্সট অ্যান্ড দি ক্রিটিক; আফটার দি লাস্ট স্কাই; ব্লেইমিং দি ভিকটিমস্; স্পারিয়াস স্কলারশিপ অ্যান্ড দি প্যালেস্টাইনিয়ান কোশ্চেন; মিউজিক্যাল ইলাবোরেশনস; কালচার অ্যান্ড ইম্পেরিয়ালিজম; দি পলিটিক্স অব ডিসপজেশন; দি স্ট্রাগল ফর প্যালেস্টাইনিয়ান সেলফ-ডিটারমিনেশন; রিপ্রেজেন্টেশন অব দি ইন্টেলেকচুয়াল; আউট অব প্লেস; পিস অ্যান্ড ইট্স ডিসকন্টেন্টস ও ক্রিটিসিজম বিটুইন কালচার অ্যান্ড সিস্টেম; ফ্রম অসলো টু ইরাক অ্যান্ড দি রোড ম্যাপ* ইত্যাদি। শেষোক্ত বইটি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর মৃত্যুর পর, ২০০৪ সালে।

*জোসেফ কনরাড অ্যান্ড দি ফিকশান অব অটোবায়োগ্রাফি, দি ওয়ার্ল্ড, দি টেক্সট অ্যান্ড দি ক্রিটিক*, এবং *মিউজিক্যাল ইলাবোরেশন* ক্ষমতার রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষত সংশ্লিষ্ট নয়। অনেকগুলো গ্রন্থ সরাসরি ইসরাইলি দখলদারিত্ব এবং ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অন্যান্য গ্রন্থ এবং নিবন্ধ ও সাক্ষাৎকারের মূল অভিপ্রায় আধিপত্যবাদী সংস্কৃতি ও রাজনীতির আন্তরবিন্যাস।

প্রচলিত সাহিত্য-সমালোচনার কার্যকারিতা এবং টেক্সট-এর পরিপ্রেক্ষিত বিষয়ক প্রশ্নে সাঈদের গুরুত্বপূর্ণ রচনা *দি ওয়ার্ল্ড, দি টেক্সট অ্যান্ড দি ক্রিটিক* প্রকাশিত হয় ১৯৭৯ সালে। এতে সাহিত্য-সমালোচনায় অন্যতর চিন্তাভঙ্গির প্রস্তাবনা পণ্ডিতদের

বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাঈদের মতে টেক্সট বা রচনা গণ-সংশ্লিষ্ট একটি জিনিস। রচনাকালীন পরিবেশ-পরিস্থিতির ছাপ ধারণ করেও প্রচারের পর তা পাঠ, পাঠের অর্থ ও প্রতিক্রিয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। তিনি পশ্চিমের উন্নাসিক টেকচুয়াল সমালোচনারীতির বিরোধিতা করে বলেন, এ হল টেক্সট-এর ভেতরের রাজনীতি, আধিপত্য ও দমননীতির প্রত্যক্ষ প্রভাবকে আলোচনার বাইরে রাখার একটি কৌশল। অতএব, টেক্সটকে পাঠ করতে হবে মানবজীবনের বাস্তবতার সাথে সম্পর্কিত করে। গ্রন্থটিতে সুইফট ও কনরাডের ওপর তাঁর নাতিদীর্ঘ আলোচনা লেখকদ্বয়ের সৃষ্টি ও দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে নতুন ধরনের আলোকপাত করেছে। *দি ওয়ার্ল্ড, দি টেক্সট অ্যান্ড দি ক্রিটিক* প্রচলিত সাহিত্য সমালোচনার রীতিনীতি সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে, টেক্সট-এর সাথে মানবজীবনের অবিচ্ছিন্ন বাস্তবতার সম্পর্কের গুরুত্ব অনুধাবনে সহায়তা করে এবং প্রস্তাব করে সমালোচনার অপেক্ষাকৃত পরিপূর্ণ একটি ধরন।

১৯৮০ সালে প্রকাশিত *দি কোশ্চেন অব প্যালেস্টাইন* আমাদের সময়ের সবচেয়ে তীব্র, রক্তক্ষয়ী আন্তর্জাতিক সংঘাতের রাজনীতির ওপর আলোকপাত। ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কারণে দেশচ্যুত, রাষ্ট্রচ্যুত ফিলিস্তিনিদের দুর্দশার জীবন্ত চিত্র এ গ্রন্থটি। লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তিনি আজ ছড়িয়ে আছে সারা পৃথিবীতে। তাদের দেশ নেই, ভোট নেই, নাগরিক অধিকার নেই। সাঈদ প্রশ্ন রাখেন এসব ফিলিস্তিনির দায় নেবে কে?

*আফটার দি লাস্ট স্কাই* (১৯৮৬) সাঈদের তীব্র রাজনীতি-সচেতন রচনা। মূলভাবগত অর্থে এটা *দি কোশ্চেন অব প্যালেস্টাইনেরই* বিস্তৃতি। একদিকে ফিলিস্তিন পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর অনুপম বিশ্লেষণ, অন্যদিকে, ফিলিস্তিনের ওপর ফটোগ্রাফার জ্যাঁ মোর-এর গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছবি মিলে *আফটার দি লাস্ট স্কাই*-কে দিয়েছে সমকালের দালিলিক স্পর্শ। এখানে সাঈদ খুঁজে দেখেছেন সমকালে একজন ফিলিস্তিনি হওয়ার অর্থ কী, একজন ফিলিস্তিনি হিসেবে কী পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় তাকে? সাঈদ বলেন যে, পশ্চিমে এমন একটি দিনও পার হয় না যেদিন ফিলিস্তিনিরা প্রধান প্রধান সংবাদে অন্তর্ভুক্ত থাকে না। কিন্তু প্রচারমাধ্যম তাদের যে ইমেজ সৃষ্টি করেছে, সাঈদ দেখান, তা খুনি-সন্ত্রাসী-অপহরণকারী অথবা সর্বহারা শরণার্থীর। ফিলিস্তিনিরা আজ পশ্চিমা প্রচার-মাধ্যমের ঐ কৃত্রিম, ঘৃণ্য রাজনৈতিক ইমেজে বন্দি।

ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কারণে ফিলিস্তিনিরা কিভাবে তাদের দেশ হারিয়েছে, ঘরবাড়ি হারিয়ে উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছে সেই মর্মান্তিক বিবরণ দেন সাঈদ। এবং সাম্প্রতিক ঘটনার আলোকে দেখান ফিলিস্তিনিরা প্রবাসী ও উদ্বাস্তু ইমেজ প্রত্যাখ্যান করে এখন নতুন আত্মপরিচয়ে উদ্বুদ্ধ হতে শুরু করেছে : সে পরিচয় প্রতিরোধের, আত্মত্যাগের, দৃঢ় চৈতন্যের সংগ্রামী এক জাতির– যারা ভবিষ্যৎ এক উজ্জ্বল সময়ের স্বপ্ন দেখছে।

*দি পলিটিক্স অব ডিসপজিশন : দি স্ট্রাগল ফর প্যালেস্টাইনিয়ান সেলফ-ডিটারমিনেশন* (১৯৯৪) ফিলিস্তিন সমস্যার ওপর লিখিত প্রবন্ধের সংকলন। এতে ১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত ফিলিস্তিনিদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রক্তাক্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারাবিবরণী তুলে ধরেছেন সাঈদ। ১৯৯৪ সালে ইসরাইলের সাথে সম্পাদিত শান্তিচুক্তিও আলোচনায় এসেছে, যাকে সাঈদ অন্যত্র অভিহিত করেছেন 'শান্তি প্রচেষ্টার সমাপ্তি' হিসেবে।

*কভারিং ইসলাম*-এর প্রথম প্রকাশ ১৯৮১ সালে। *অরিয়েন্টালিজম* লিখে সাঈদ প্রাচ্যতাত্ত্বিক বুদ্ধিজীবীবৃত্তে ধস নামিয়েছিলেন, সৃষ্টি করেছিলেন অসংখ্য বুদ্ধিবৃত্তিক শত্রু। *কভারিং ইসলাম*-এ তিনি পশ্চিমা প্রচারমাধ্যমের সাম্রাজ্যবাদী ও সাম্প্রদায়িক রূপটি উন্মোচন করেন। এর ফলে তিনি আর কখনো প্রচারমাধ্যমের সুনজরে আসতে পারেননি। তার ফলাফলও উল্লেখযোগ্য বৈষয়িক ক্ষতির কারণ হয়েছে। আমরা প্রচারমাধ্যমের বদৌলতে প্রায়শই চমস্কি বা দেরিদার বিশাল ছায়ার মুখোমুখি হই, অথচ সাঈদকে অত ভালো করে জানি না, যদিও আমাদের অর্থাৎ প্রাক্তন উপনিবেশগুলোর মানুষদের জন্যেই নিবেদিত ছিল সাঈদের সারা-জীবনের সৃষ্টিশীল তৎপরতা।

যাহোক, *কভারিং ইসলাম*-এ সাঈদ প্রতিদিনের সংবাদ পরিবেশন, ফিচার, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, সাক্ষাৎকার ঘেঁটে দেখান পশ্চিমের প্রচারমাধ্যম দীর্ঘদিন ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের খুনি, সন্ত্রাসী, অপহরণকারী হিসেবে চিত্রিত করে আসছে। ফিলিস্তিনি মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে অথবা সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের মুখে আত্মরক্ষার জন্যে ইরানের যুদ্ধকৌশলকে ব্যাখ্যা করা হয় সন্ত্রাসী তৎপরতা বলে, কিন্তু আগ্রাসনের নিন্দা করা হয় না। এ হল প্রচারমাধ্যমের ভাষ্য সৃষ্টির রাজনীতি। সাঈদ আমাদেরকে পশ্চিমা প্রচারমাধ্যমের এ তৎপরতা ও তার ভাষ্যের রাজনীতি সম্পর্কে সতর্ক করেন।

*রিপ্রেজেন্টেশন অব দি ইন্টেলেকচুয়াল (১৯৯৪)* সাঈদের আরেকটি উল্লেখযোগ্য রচনা। সারা পৃথিবীর জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ যখন তথ্যব্যবসায় জড়িত অথবা সংশ্লিষ্ট তখন বুদ্ধিজীবী পরিভাষাটি কী অর্থ বহন করে, কারা বুদ্ধিজীবী, কী তার চারিত্র্য, কী তার দায়িত্ব—এসব প্রশ্নের জবাব সন্ধান করা হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। এ প্রসঙ্গে সাঈদ বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে প্রচলিত মতামত তুলে ধরেন। ইতালীয় বামপন্থী এন্টনিও গ্রামসি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, ঋণ-পরামর্শক সকলকেই বুদ্ধিজীবী বলে অভিহিত করেছেন যাদের কাজ হল ক্ষমতামুখী প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রের পক্ষে বুদ্ধি প্রয়োগ করে নিজস্ব স্বার্থ অর্জন। অন্যদিকে, ফরাসি জুলিয়ান বেন্ডা প্রমুখের সংজ্ঞানুযায়ী বুদ্ধিজীবীদেরকে সমাজের সংখ্যালঘু, মহৎহৃদয় মানুষ বলে মনে করা হয়, যার দায়িত্ব ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। বুদ্ধিজীবীর পরিচয় প্রসঙ্গে সাঈদ

প্রথাগত মতামত এবং বামপন্থী চিন্তাধারার মাঝামাঝি অবস্থান গ্রহণ করেও জুলিয়ান বেন্ডা'র মতের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। সাঈদের মতে বুদ্ধিজীবীর মেধা, সততা, দায়িত্ববোধ তাকে অন্য মানুষদের থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে। বুদ্ধিজীবী তাই নিঃসঙ্গ মানুষ। *"বুদ্ধিজীবী . . . পরবাসী, সংখ্যালঘু, অ-পেশাদার–এমন এক ভাষার অধিকারী, যা ক্ষমতার মুখের ওপর সত্য উচ্চারণ করে" (রিপ্রেজেন্টেশন..., ১৯৯৬, ীারর)*। সাঈদ মনে করেন পরিচ্ছন্ন মানবিক বোধ, অবিচ্ছিন্ন সততা, চিন্তার তীব্রতা এবং সজাগ চৈতন্য–এ হল বুদ্ধিজীবীর আজন্ম সম্বল। *রিপ্রেজেন্টেশন অব দি ইন্টেলেকচুয়াল* আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত সর্বশেষ গ্রন্থ *ফ্রম অসলো টু ইরাক অ্যান্ড দি রোড ম্যাপ (২০০৪)*-এ সংকলিত ৪৬টি অসাধারণ নিবন্ধে সাঈদ মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে আমেরিকা ও ইসরাইলের তৎপরতা সম্পর্কে এমন সব তথ্য প্রকাশ করেছেন যেগুলো কোনোদিন মার্কিন প্রচারমাধ্যমের মুখ দেখেনি।

এডওয়ার্ড সাঈদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দু'-একটি কাজের একটি হল *কালচার অ্যান্ড ইম্পেরিয়ালিজম* (১৯৯৩)। এ গ্রন্থে সাঈদের চিন্তা প্রথা ও চর্চার সীমানা পেরিয়ে পশ্চিমের সংস্কৃতির এমন-এক দিক উন্মোচিত করে যার সাথে সম্পর্কিত আধিপত্য, দমন ও ক্ষমতার রাজনীতি। ইউরোপীয় এবং সামগ্রিকভাবে পশ্চিমের সংস্কৃতির ইতিহাসের অনেক পেছনেও আধিপত্যবাদী চিন্তাভাবনার প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

সাঈদ পশ্চিমা সংস্কৃতিতে সাম্রাজ্যবাদের বীজ শনাক্ত করার জন্যে বেছে নেন সংস্কৃতির একটি ক্ষেত্র–সাহিত্য। জেন অস্টিন থেকে সালমান রুশদি, ইয়েটস থেকে প্রচার-মাধ্যমের তৎপরতাও তাঁর অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের আওতায় আসে। *অরিয়েন্টালিজমে* তাঁর পর্যবেক্ষণ সীমিত ছিল মধ্যপ্রাচ্যে। *কালচার অ্যান্ড ইম্পেরিয়ালিজম*-এ তিনি দৃষ্টি প্রসারিত করে দেন পৃথিবীর সকল প্রাক্তন উপনিবেশে, যেখানে উপনিবেশিক শক্তি কখনো না-কখনো তাদের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন চালিয়েছিল। এর মধ্যে আছে আফ্রিকা, পাক-ভারত উপমহাদেশ, দূরপ্রাচ্যের অংশবিশেষ, অস্ট্রেলিয়া, ক্যারিবীয় অঞ্চলের বিভিন্ন দেশ। এসব দেশে বসে অথবা তার অভিজ্ঞতা নিয়ে সাম্রাজ্যের গর্বিত নাগরিক সমকালীন লেখকগণ যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন সাঈদের আলোচনার লক্ষ্য সেইসব সৃষ্টি।

ঐসব সাহিত্যিক রচনায় দু'টো বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করেন তিনি : প্রথমত, ওগুলোয় উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীকে দেখা হয়েছে মানসিকতার একক একটি ছাঁচে। যেমন ঐ সব লেখায় পাওয়া যায় 'ভারতীয় মন', 'ক্যারেবীয় নারীচরিত্র', বা 'আফ্রিকান স্বভাব', 'জ্যামাইকান আচরণ' ইত্যাদি পরিভাষা ও ধারণা। এর অর্থ হল ঐ লেখকের নিকট সকল ভারতীয়'র মন একই রকম, সকল ক্যারিবীয় নারীর চরিত্র এক, আফ্রিকান মানবগোষ্ঠী বুঝি বা যুগ যুগ ধরে বেঁচে আছে স্বভাবের একটিমাত্র আদর্শ নিয়ে।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল, ঐসব লেখকের প্রত্যেকের রচনায় সাম্রাজ্য বিস্তার, উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। নমুনা হিসেবে জোসেফ কনরাডের *হার্ট অব ডার্কনেস*-এর কথা ধরা যায় *(ইয়ুথ অ্যান্ড আদার স্টোরিজ, ১৯০২)*। কাহিনী-কেন্দ্রে আছে পশ্চিমের 'সভ্যতা'র ছোঁয়াবিহীন আফ্রিকার অন্ধকারাচ্ছন্ন অঞ্চল। বক্তা মার্লো যদিও মুখে সাম্রাজ্যবাদের সমালোচনা করেন কিন্তু তাঁর মনোভাব ঘুরেফিরে যুক্তির জাল বুনে আফ্রিকার স্বায়ত্তশাসনের বিরুদ্ধেই। সাঈদ তাই মন্তব্য করেন, "কনরাড আমাদের দেখাতে চান (সাদা মানুষ) কুর্দজের লুটের অভিযান, নদীপথে মার্লোর ভ্রমণ এবং গোটা কাহিনীটিই কিভাবে এই একটিমাত্র মূলভাব সমর্থন করে যে, ইউরোপীয়রা দক্ষ হাতে সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে, ভবিষ্যতে (আফ্রিকায়) তা অব্যাহতও রাখবে" *(কালচার অ্যান্ড ইম্পেরিয়ালিজম, ১৯৯৩, ২৫)*।

সাঈদ আরো কয়েক যুগ পেছনে গিয়ে চার্লস ডিকেন্সের *দুম্বে অ্যান্ড সন্স* (১৮৪৮) থেকেও উদাহরণ দেন। ঐ গ্রন্থে দেখা যায়, দুম্বে তার নবজাত সন্তানের জন্যে কামনা করছে পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্যিক আধিপত্য, যা আসলে উপনিবেশিক আধিপত্যেরই একটি রূপ (পূর্বোক্ত, ১৩)। একইভাবে সাঈদ উপনিবেশিক আকাঙ্ক্ষা চিহ্নিত করেন জর্জ এলিয়ট, রুডইয়ার্ড কিপলিঙ, জেন অস্টিন, আলবেয়ার ক্যামুসহ অনেকের রচনায়।

চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত *কালচার অ্যান্ড ইম্পোরিয়ালিজম*-এর তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বিশ্লেষিত হয়েছে বিরোধ ও প্রতিরোধাত্মক সংস্কৃতির উত্থান। বিশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশক থেকেই সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির বিপরীতে প্রতিরোধাত্মক সাহিত্যের সূচনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রায় সকল উপনিবেশ স্বাধীনতা লাভ করে। ক্রমে সাম্রাজ্যবাদী সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রভাব কাটিয়ে ওঠার প্রয়াস দেখা দেয় সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, নৃ-তত্ত্বসহ মানব-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়। সূচনাপর্বে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর লেখকদের মধ্যেও বিপরীত সংস্কৃতির প্রতি ইতিবাচক মনোভাব লক্ষ করা যায়। ক্রমে বিকশিত হয় প্রতিরোধের তীব্র ভাষা।

এডওয়ার্ড সাঈদের তীক্ষ্ণ-তীব্র চিন্তনভঙ্গি, নিরপেক্ষ ও অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ, ভাষার কৌশলী ব্যবহার *কালচার অ্যান্ড ইম্পোরিয়ালিজমকে* ধ্রুপদ রচনার মর্যাদা এনে দিয়েছে। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতা ও দমননীতির সংস্কৃতির বিশ্লেষণ করতে হলে এখন আর *অরিয়েন্টালিজম* ও *কালচার অ্যান্ড ইম্পোরিয়ালিজমকে* এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে পশ্চিমের উপনিবেশগুলোর বুদ্ধিবৃত্তি, পশ্চিমের সাংস্কৃতিক প্রভাবনের ফলেই আধুনিকতার নেতিবাদী বৃত্তে ঘুরপাক খেয়েছে দীর্ঘদিন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে প্যারিসে প্রথমে কাঠামোবাদী আন্দোলন, পরে উত্তর-কাঠামোবাদ নতুন চিন্তাভঙ্গি হিসেবে বিপুল আলোড়ন তোলে। উত্তরাধুনিকতা পাশ্চাত্যের চিন্তাভাবনার ফসল; ওখানেই ষাট, সত্তর ও আশির দশকে এই নতুন চিন্তারীতির বিভিন্ন দিকগামী বিস্তার আমরা লক্ষ করি।

এ সময় ফরাসি চিন্তাবিদ মিশেল ফুকো ইউরোপীয় চিন্তার দার্শনিক ভিত্তি সম্পর্কেই প্রশ্ন তোলেন, সন্দেহ প্রকাশ করেন *এনলাইটমেন্ট* ও পশ্চিমা-মানবতাবাদের যাথার্থ বিষয়ে। দেরিদা ভাষায় দ্যোতকের খেলার উল্লেখ করে টেক্সটকে প্রায় সকল কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বেচ্ছাচারী অর্থ-সঞ্চারের তত্ত্ব দেন; এর ফলে পারিপার্শ্বের রাজনীতি থেকে টেক্সটকে আলাদা করে ফেলার সুযোগ ও ঝুঁকি সৃষ্টি হয়।

উত্তরাধুনিক চিন্তাভাবনার এই জাগরণকালে পশ্চিমের ঐ সব মত ও পথ এড়িয়ে প্রাচ্যের মানুষ এডওয়ার্ড সাঈদ উপনিবেশকে আধিপত্যের সাংস্কৃতিক রূপটি পরীক্ষণে মনোনিবেশ করে সূচিত করেন উত্তর-উপনিবেশবাদী-ভাবনা-প্রক্রিয়ার। আলজেরিয়ায় ফরাসি উপনিবেশের বিরোধিতা করতে গিয়ে ফ্রান্জ ফানো উপনিবেশিক শক্তি ও উপনিবেশের সম্পর্কে আলোকপাত করেছিলেন আরো আগে, তবে সাঈদের মাধ্যমেই তা তত্ত্বের সুষম গঠন ও প্রয়োজনীয় কৌশল অর্জন করে। উপনিবেশিত মানবগোষ্ঠীর মনোজগতে দমন ও আধিপত্যের বিশ্লেষণে তিনি শনাক্ত করেন প্রাচ্যতাত্ত্বিক ডিসকোর্সকে। *অরিয়েন্টালিজম* এবং *কালচার অ্যান্ড ইম্পোরিয়ালিজম* প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে অনুন্নত বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে যে অভাবনীয় পরিবর্তন সূচিত হয় তাকে প্রায়-পুনর্জাগরন আখ্যায়িত করা যেতে পারে। আয়ারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ও ভারতে *অরিয়েন্টালিজম*-এর চিন্তাসূত্রের অনুষঙ্গে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজও হয়েছে।

এখন প্রাচ্যতত্ত্ব কেবল প্রাচ্যে পশ্চিমা আধিপত্যের ব্যাখ্যা নয়, তা' একটি ভাবনাভঙ্গিও, যা প্রয়োগ করা হচ্ছে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের উপনিবেশিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিশ্লেষণে। যে কোনো সাংস্কৃতিক আধিপত্য/প্রভাবন/বিকৃতি সাঈদের তত্ত্বে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। প্রাচ্যের প্রাক্তন উপনিবেশগুলোয় উত্তর-উপনিবেশিক চিন্তাধারাই এখন প্রবল, যা আত্মানুসন্ধানী, ঐতিহ্যমুখী, নিজস্ব সাংস্কৃতিক ভিত্তির খোঁজে অবিরাম প্রশ্নমুখর। পশ্চিমের আধিপত্যে সূচিত ও ব্যাখ্যাত উত্তরাধুনিক ভাবনারীতির অন্যপিঠে এই নতুন দিগন্তের সূচনা সাঈদের এক বিরাট অবদান।

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ ছিলেন পণ্ডিত, নন্দনতাত্ত্বিক ও সমালোচকের এক বিরল ও মেধাবী সংশ্লেষ। সাংস্কৃতিক আত্মানুসন্ধানে নিয়ত উন্মুখ নতুন প্রজন্মের কাছে তিনি প্রেরণা ও আদর্শ। সাঈদ পশ্চিমের বুদ্ধিবৃত্তিক জগতের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই প্রভাব বিস্তার করে গেছেন।

ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের কাছে তিনি কোনো দায় অনুভব করেননি, তাঁর দায় ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক চৈতন্যের নিকট, যা তিনি নিজেই চিহ্নিত করেছেন (দ্র. *রিপ্রেজেন্টেশন অব ইন্টেলেকচুয়াল*, ১৯৯৬)। মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামি দেশগুলোর জনগোষ্ঠীর পক্ষে কথা বলার কারণে তাঁকে কম দুর্ভোগ পোহাতে হয়নি। তবু মানবতা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রশ্নে তাঁর ছিল দৃঢ় ও সক্রিয় ভূমিকা। প্রথা ও প্রতিষ্ঠানবিরোধী, ক্ষমতাবিরোধী এমন সৃষ্টিশীল মানুষের জন্যে নোবেল পুরস্কার অপেক্ষা করার কথা নয়। তার প্রয়োজনও ছিল না। এডওয়ার্ড সাঈদ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে জাগ্রত করে গেছেন আমাদের চৈতন্যকে, যেমন বলেছেন এ সময়ের আরেক বেপরোয়া, মেধাবী বুদ্ধিজীবী আব্রাম নোয়াম চমস্কি– "*তিনি (সাঈদ) আমাদের এটি বুঝতে সহায়তা করেন যে আমরা কে, ক্ষমতার দাস না হয়ে নৈতিক প্রতিনিধি হিসেবে বাঁচার জন্যে আমাদের কী করা উচিত*"।

গ ল্প

## যেদিন রুগ্নতাকে মেনেছি প্রভু

.........................................

**শ ও ক ত  হো সে ন**

রোদ ছিলো না, কাকাতুয়া পায়রা ছিলো না, জলের সুবর্ণধারা ছিলো না সেখানে। অফুরান বাষ্পের ভেতর কেঁপেছিলো অঙ্কুরোদ্‌গম; সে বেঁচেছিলো! ঘেমেছিলো আকাশ ও পাতাল। বর্ষা নামে নি। কুয়োর নির্জনতা আসে ভেসে...

আশ্রয় বলতে মা আর পানি। দু'টোকেই বলি মাম। আসমান থেকে এসেছি। কী শান্ত-নির্জন-অন্তর্মুখী! আদর পেলে বুঝি। অনাদরে মুখ ফেরাতে শিখে গেছি।

মা'র বিয়ের আগে কারো জন্ম হয়–? হয়েছিলো; জন্মের পর, পালকি ক'রে দাদাবাড়ি যাই।

পুরো বাড়ি কাঠিন্যের গ্যাঁড়া। কেউ বোঝে না। কোলে নেয় না। মাটিতে হাঁপর পাড়ি। লাল কেড়া খাই। নিজের মল ছানি। সম্পূর্ণ রুগ্ন হ'য়ে যাই।

বাড়িসুদ্ধ রোগগ্রস্ত। নোংরা কলঘাটা গরুঘর। কর্দমাক্ত উঠোন। ঘর দিয়ে পানি ঝরে। স্যাঁতসেঁতে। পাটখড়ির বেড়ায় ঝিরঝির বাতাস, বিষ্টির হেচ্‌লা আসে। কাঁথা-বালিশ বরফ। ঘরের পাছে গরু থাকে। মশা-ব্যাঙ-ইঁদুরের আড়ৎ। হুতুমপ্যাঁচা গরুর ওলানের নিচে বসে। দেখেই চিৎকার! বাড়ির পাছে কোপ্‌পাখি ডাকে। গভীর রাতে ভয় বাড়ে। ল্যাম্পে লোহা পুড়লে কল্‌জেতে ঘা লাগে তখন ডাকা বন্ধ হয়। জ্বিন-শয়তান-পেত্‌নির ভয়! বাড়ির পাছে শেয়াল ডাকে পাটক্ষেতে। ডাহুক রাতভর ডাকে। গলা দিয়ে রক্ত উঠলে থামে।
ছোটোকাকা বস্তায় বিড়াল ভ'রে আছড়ে মারে। কারো খেজুরচারায় কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে দেয়। কেমন ভয়। দাদার পাশের ঘরে মজি থাকে। ও আমাদের পাছে নিয়ে গুলতিতে গাছ থেকে পাখি পেড়ে আনে। পাখি বলতে কাক আর শালিক। ওসব বাদে ভালো পাখি ছিলো না। গাছ বলতেও বড়জোর খেজুর-বাবলা-বাঁশঝাড়। বিষ্টির পানিতে দু'কাচারির মাঝে সাঁকো দিই। ডিঙ্গি ছাড়ি। মজির মর্জি চ'ড়ে গেলে সাঁকো-ডিঙ্গি ভাঙে।

মাথাভর্তি বেগবেগে ফোঁড়া ব্যথায় টনটনে। গোসলে কী কষ্ট! মুখ চেপে ধরে, কাঁদতে পারি না। শত হলেও মা তো! ন্যাংটো ক'রে তালু থেকে তলাবধি ডলে। গামছায় মুছে কোলে ক'রে রোদে দেয়। গোসলের পর চোনালে রোগ সারে না। সারাক্ষণ ভালো যেই গোসল শেষ, মুত এসে হাজির।

অন্যদের ছেলেপুলে নাদুসনুদুস, মা'র ছেলে টিংটিংয়ে। এ নিয়ে মাথাব্যথা আছে তাও না। নাকে প্যাচপ্যাচানি প্রায়ই ছিদ্র বুজে যায়, মুখ দিয়ে বাতাস ছাড়ি। পেটব্যথা জ্বরজ্বর লাগে। খেলতে গেলে আলাদা কৌমদি– মেয়েলি রোগাটে। পুকুরে সাঁতার কেটে ভিজানো নৌকোর মাথায় ভরদুপুরে ঝিমোই। বন্ধুসঙ্গে কুস্তিতে আকাশ দেখি।

ওরা পেচ্ছাব দূর-কচুপাতায় লাগায়, আমি মাত্র অধ্যেক পথ– আমি ঢিবির কাছেও না, ওরা বেগে বালুর ঢিবি গুঁড়িয়ে দেয়। ডুমুরগাছে তরতর ওঠে। বরই তেঁতুল পেড়ে খায়– অথচ গোড়া চিনেছি সবে!

সহসা খেলতে নেয় না– পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়াবাঁধা দেখি। কে যেন কী খেয়ালে গোবরের দলা ছুড়েছিলো। ধপ্ ক'রে লাগলো গিয়ে জোলা সেলিমের মুখে। লেপ্টে মুখোমণ্ডল সমতল। কে-ছুড়লো? সবাই মসজিদের কাছে যায়। এক-এক ক'রে ভেতরে ঢুকে ক্বিরা কাটে। ক্বিরা কাটলে মহাপাপ হবে!... সেই যে একদৌড়ে ঘরে ঢুকেছিলাম, দু'দিন বেরোই নি।
ছোটকাকা ঐ বয়েসি একখানা সাহেবি পোশাক এনেছিলো। সাহেবি কিছু মানিয়ে নিতে পারি না, অর্থ হয় রুগ্নতায় পেয়েছে অতোখানি! পরে কাকা সাহেবি-ঐ স্যুট টাট্টিতে ফেলে দিয়েছিল।

ঝামেলা অপছন্দ, ঝগড়া-ঝামেলা লেগেই আছে। প্রথমে মহিলা জানতো না, পরে দাদীর কাছে শিখেছে!

ঘরে কোচের পুরনো একটি কালি। ও নিয়ে খেলি। টুনটুনি পুকুরের ঢালে ছিট্কি লতায় লাফায়। কী মনে ক'রে ছুড়েছিলাম আহা! ওভাবে গেঁথে যাবে বুঝতে পারি নি। টুনটুনিবুক ঐ টুনটুনির চেয়েও, জটিল কোনো কষ্ট পেয়েছিলো! হত্যায় এতো পাপ, হত্যা করেছিলাম–

আমাকে রেখে বড়জোর পানি আনতে যায় এছাড়া আঁচলেই রাখে। সেবার কী করতে কে জানে, বাপের বাড়ি রেখে অতোদূর ঢাকায় গিয়েছিলো। বিষ্টির ভেতর ছোটোকাকা আর পাশের বাড়ির ফজলু আমাকে চুরি ক'রে নিয়ে গিয়েছিল।

ঢাকায় বড়লোক ফুফুর বাড়ি, ঝিয়ের কাজ করে, ঢাকায় যাওয়া তার বিপক্ষে যায়। শাবকের ঘ্রাণ এতো পাগলপারা– দেখি অস্থির দু'টো হাত– বৃদ্ধাঙ্গুলের ডগাভর্তি অসংযত কুচিকুচি দাগ, তারাভর্তি মরিচের ঝাঁজ– হলুদ ক্রন্দন...!

রাতে খাওয়া শেষে শুধু হাতের লেখা। শুয়ে খাতার রুলকাটা দাগ অনুসরণ ক'রে হাত চলে। কেরোসিন ল্যাম্পের আলো কাঁপে। চোখ খাতা ভুলে কম্পমান আলোর গভীরে আটকা প'ড়ে– ক্লান্ত হয়ে ল্যাম্পের আগেই তার পাদদেশে ঘুমিয়ে পড়ে।

সন্ধ্যা থেকে ল্যাম্পের পাশে মা। পায়ের কেনিচাপা ব্লেড দিয়ে ছাড়ায়। নাকের কাছে ব্লেড নিয়ে দুর্গন্ধ শুঁকে দেখে। কিছু সময় পর পর নাক আর গলা দিয়ে ঘ.. ঘ.. শব্দ করে। ঠাণ্ডা লাগলে নাক-গলা এজমায় চুলকোয় তখন ওরকম শব্দ করে।

ঘুমোনোর আগে শেষবার তাকিয়ে লক্ষ করি কপালের চামড়া কুঁচকিয়ে তখনো সুঁইয়ের ভেতর সুতো গাঁথতে পারে নি। ঘুমিয়ে পড়ি। পরে পেরেছিলো কি না জানি না।

আমি ছোটো, আলাদা চকির অভাব– দু'কারণে তাদের সাথে ঘুমোতে হয়। ছোটো হলেও গভীর রাতে চকি নড়তে থাকলে সকালে ঘৃণা হয়।

আজ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তুলনামূলক আগে। সারারাতে একবারও চকি কাঁপেনি। ঘুমের ভেতর কীসের হৈচৈ কানে এসেছিলো। অন্যসব রাতে পেসাবের জন্য মা'র ডাকে দু'তিন বার ঘুম ভাঙে। আজ পুরোরাতে একবারও ক্লান্ত শরীর টের পায় নি।

অধিকাংশ দিন মোরগের ডাকে ঘুম ভাঙে। মোরগের ডাকে ঘুম ভাঙলে পুলক লাগে। ডাক শেষ হয়েছে অনেক আগে, আজ কুকুরের আর্তনাদ শুনে চোখ মেলি। আব্বা একা, আমার দিকে পেছন ফিরে উবু হ'য়ে শুয়ে আছে। মশারির শ্রী দেখে বোঝা যায় তার খাটানো। পাটখড়ির পাটাতনের উপরে তখনো শেষ হয় নি ইঁদুর-বাইতার ঝগড়া। মশারির ছাদের বহুভুজাকৃতি ছিদ্র দিয়ে পাটাতনের দিকে তাকাতে, ডান চোখে ঢুকে পড়ে উপর থেকে নেমে আসা বাইতার গুঁড়ি গুঁড়ি গু। চোখ ডলতে ডলতে বিছানা ছেড়ে দৌড়ে ঘরের পাছে খোলা জায়গায় যাই। পরনের লুঙ্গিতে অনেকক্ষণ ভাপ দিতে থাকি।

গুঁড়ি একপর্যায়ে চোখে থাকার ক্ষমতা হারায়, বাঁ কোণে অবস্থান নিয়েছে।

আঙুলের কোমল ডগা বাড়িয়ে দিতে গুঁড়ি নেমে আসে। দীর্ঘ সাধনায় হাতে পেয়ে ওর প্রতি সামান্য অসামাজিক মায়া জমে ওঠে। ছুড়ে ফেলে কয়েক মুহূর্ত শূন্যতায় ভাসি। গুঁড়ির কথা ভুলে দৃষ্টি বাড়াই পুকুরের ওপাড়ে।

বাঁশঝাড় ঘেঁষে এদিকে তীক্ষ্ণ তাকিয়ে ব'সে আছে রুগ্‌ণ মহিলা! গভীর রাত থেকে একটানা সঙ্গ দিচ্ছে প্লাস্টিকের একটি ঝুড়ি। যতোদূর জানি বিয়ের সময় বাবাবাড়ি থেকে দিয়েছিলো। ঝুড়িটি মেয়ের প্রতি বাবার কর্তব্যপরায়ণ এবং ভালোবাসার প্রমাণ বহন করে। যতোবার স্বামীর চিরাচরিত অধিকারের চড়লাথিপিটুনির শিকার, ততোবার ঐ ঝুড়িতে কিছু কাপড় নিয়ে বাবার বাড়িতে চ'লে যাওয়ার নির্মম ভনিতা!

চোখ থেকে চোখ নামাতে পারি না। কাছে যেতে হাউমাউ কান্না–। গর্ভে ধরছি বড় হইছোস ভাঙ্গাকুলা দিয়া এখন কী হইবে-? তোরা থাক আমি গ্যালাম!

সংগোপন-অভিমানী, সংসারী-শক্ত হাত ধ'রে ফেলি। চোখের নিয়ন্ত্রণ মিলিয়ে যায় ...

ঘামে ভেজা কাপড়-ব্লাউজ সরিয়ে ঘামবিচিতে পুরু পিঠ জুড়ে গতানুগতিক লাল-লাল দাগ!

ধবধবে শাদা বেড়াল তখন দু'জনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মলিন। নেজ নাড়ালো একটি কুকুর।

বেড়াল কুকুর আজিমন ছাড়া বাড়ির সবাইকে পর মনে হয়; কারো অনুরোধ পেলেই বাঁশঝাড় ছেড়ে ঘরে ফিরে গভীর নিদ্রায় চলে যেতে পারে।

আজিমন টের পেলে নিতে আসতো। ভাত-রুটি-ফ্যান চুরি ক'রে রাগ-অভিমানকালে দিয়ে যেতো; হাসতে দেখেছি কাঁদতে দেখেছি মা'র সাথে। পাল্লা দিয়ে না খেয়ে থেকেছে– ও। সুযোগ পেলে সাহসে বুক বেঁধে পক্ষও নিয়েছে।

বহুদিন এ বাড়িতে আছে, মোরগডাকা সকাল থেকে গভীর রাত অবধি চলে অবিরাম ধকল। যারা আশ্রয় দিয়েছে তাদের দুর্নাম পাড়ে সারাক্ষণ। কতদিন দুর্নাম পেড়ে গভীর কোনো দুঃখে কেঁদেছে। সন্ধ্যার পড়া ভেস্তে গেছে সেসব কান্নার বানে।

আজিমনের মা কে, বাবা কে, কোথা থেকে ও এসেছে কিছুই জানি না। আমাকে আসমান থেকে চালের ছিদ্র দিয়ে পাঠানো হয়েছে সেকথা শুনেছি ওর মুখে।

আব্বা ইশকুলে পড়াতে যাবে। সকালে গরম ভাত হয় নি। দু'দিন আগে সর্দি সেরেছে, পান্তা খাবে না। আজ না-খেয়ে পড়াতে হবে। ইশকুলে যাওয়ার সময় একবার মাঝারি শব্দ ক'রে দূর থেকে বলেছিলো, তোর মা'কে নিয়ে ঘরে আয়।

দীর্ঘ পীড়াপিড়িতেও যে মুখ ছিলো অচেতন প্রায় সামান্য ডাকে সে মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে গেল! লোকটা সত্যি বাড়ি ছেড়েছে কি-না নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমাকে বলে, একটু দেখে আয়।

ঘরে শার্ট-ঘড়ি না-দেখে নিশ্চিত হই। দরজায় দাঁড়িয়ে ইশারায় জানাই আব্বা নাই। ঝুড়ি বাঁ হাতে, ডান হাতে মোচড়ানো কাপড় ঠিক করতে করতে ধীর পায়ে বাড়ির দিকে আগায়। ঘরে ঢুকে চকির হোগলা সরিয়ে খালি তকতায় হাত-পা দলা ক'রে শুয়ে পড়ে।

একবার মৃদু স্বরে বলে একটু পানি খাওয়াতে পারি কি-না। কলসির পানি ফুরিয়েছে অনেক আগে। দূর-টিউবঅয়েলের পানি এনে দেখি, ঘুম সর্বাত্মক সামর্থ্য দিয়ে ঢেকে দিয়েছে। বায়েজীদ বোস্তামির বিশ্বাস-কে অতিক্রম ক'রে সেদিন অপরাধ করতে পেরেছিলাম।

আজিমন বড়ঘরে ঘুমোয়। দাদী দাদা কাকা ওঘরেই থাকে। ফুফুরা একপাল সন্তান নিয়ে মাসকাবারি বেড়াতে আসলে টিনশিট-ওয়ালের বিশাল দোতলা ঘরটি হৈ-হুল্লোড়-পায়খানা-পেসাবের গন্ধে ভরে রাখে। আজিমনকে খুব সকালে পাঠানো হয়েছে রারী বাড়িতে। ছাগলের বাচ্চা আনতে। দাদী দু'বছর আগে একটি মাদি ছাগল পালতে দিয়েছিলো। পাঁচ-মাস আগে দু'টি বাচ্চা দিয়েছে। ভাগে একটি পাওয়া যাবে। বাচ্চা আর মা ছাগল-কে নিয়ে ওর ফেরার কথা।

ঘরে শুধু পান্তা আছে। রাতে বড়ঘর থেকে আব্বার জন্য আনা ভাতের বাড়তিটা। পাকঘরের কোনায় গাছে দু'টো রুগ্ন মরিচ ঝুলছে। ওদিয়ে দু'চার লোকমা পড়েছে পেটে।

খাওয়া শেষে আড়মোড়া'র অভ্যাস। সামান্য স্বস্তি ভর করেছিলো। মা'র দিকে আরেকবার নজর পড়তে উধাও স্বস্তি। ব্যক্তিগত মাটির ব্যাংকটির গায়ে চোখ রাখি। হাতে নিই। বঁটির থেঁত্লানো ডগা দিয়ে মুখ বড় করি। উপুড় ক'রে ঝাঁকুনি দিতে অসংখ্য মূদ্রা। বার টাকা বার সপ্তায় যুগিয়েছিলাম।

ম্যাচলেট লুঙ্গি বারবার খুলে যায়। কাঁধের উপর আড়াআড়ি তুলে চিরাগুড় আনতে দোকানে যাই। ভিজিয়ে খেতে দেখেছি বহুবার। গাঙপাড় যেতে কে যেন বলেছিলো ছুটে আসা বলটি ফেরত দিতে। ফেরত দিতে গিয়ে চিরাগুড়-মা'র কথা ভুলে খেলায় বুঁদ হ'য়ে যাই।

কখন লুঙ্গিতে কাছা মেরে– টাকা কোঁচোড়ে গুঁজে নিমগ্ন বলখেলা শুরু করেছিলাম, টের পাই নি। ভালো খেলতাম না। হঠাৎ পায়ে লেগে বল বেশ উপরে উঠেছিলো। পুলকিত

মনে– মুহূর্তে মলিন আভা! বল উপর থেকে নামলো না। খেজুরগাছের মাথায় কাঁটার আঘাতে দম ছাড়ছে।

ওরা আমার অপরাধবোধ বাড়িয়ে দিয়েছিলো। গাছে উঠতে পারি না। পাশের বাড়ির লম্বা বাঁশ দিয়ে বল পেড়ে আনি। কোঁচোড়ের টাকায় ক্ষতিপূরণ দিই।

গাঙপাড়ের অসহায়বোধ ঘরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ত্রস্ত পা ক্রমে ভারী হ'য়ে আসে। কোনোমতে ঘরে পৌঁছে দেখি, সেভাবেই কাত হ'য়ে প'ড়ে আছে। পায়ে মাছি হাঁটছে সাড়া নাই। কেউ খোঁজ নিতে আসে নি–।

পেছন দরজায় দাঁড়িয়ে দেখি আজিমন খেজুরতলায় ছাগলের বাচ্চা নিয়ে খেলছে। ও বুঝি কিছুই জানে না! কখন ভাত চড়াবে কে জানে। ক্ষুধায় মেজাজ খিট্‌খিটে। পুরো পৃথিবী মরতে বসেছে! দুর্বল ঠেকছে খুব। শেষ ভরসা মাম! দু'বাটি খেয়ে মা'র পা'র কাছে শেষ তক্‌তা বরাবর শুয়ে পড়ি। একটি মুরগি ঘরময় চ'ষে যায়। জান্‌লে এর পরও পিড়িবেঞ্চচকি বালতিভর্তি পানিতে ধুয়ে ছাড়তো। ঘুমের ভারে ক্লান্ত চোখ বুজে আসে।

একঘুমে তির্যক রোদ বারান্দা পাড় হ'য়ে ঘরে হাজির। মাথার কাছে মা'র পা নেই। বুকে বিদ্যুতের শক! আব্বা তখনো ফেরে নি। বড়ঘরে ভয়ে ভয়ে ঢুকি। সবাই পেট ঠাণ্ডা ক'রে আসর জমিয়েছে। মা'কে পেলাম না। কেউ তাকালোও না!

ক্ষোভে-লজ্জায় পেছন দরজায় দ্রুত বের হ'য়ে আসি। পাকঘরের কাছে যেতে আজিমন হাত চেপে ধরে, অতোজোরে ঝাড়া দিয়ে ছুটতে পারি নি; চিরাচরিত স্বভাবের কাছে বন্দি হ'য়ে গেলাম! গভীর ক্ষুধায় দু'টি প্রাণী তখন ফ্যান খেয়ে যায়; প্যাকপ্যাকে কাদায় দাঁড়িয়ে ভাঙা বারকোষে পাকঘরের বাইরে একজন, আরেকজন যথাসম্ভব ভেতরে...

এতো রুগ্নতা আমার; সাদামাটা চোখের চাউনি; এতো পশ্চাৎপদ! কখনো দেখে না সে অন্দরমহল। অফুরান বাষ্পের ভেতর ফেঁপেছিলো দিনানিপাত। আহা জগদ্দল। বারবার বেঁচে গেছি– যেদিন রুগ্নতাকে জেনেছি প্রভু।

## প্রকাশিত গল্প নিয়ে মন্তব্য

.....

### জা কি র  তা লু ক দা র

[এ সংখ্যায় প্রকাশিত গল্পের গল্পকারের নাম মুছে দিয়ে এর ওপর পাঠ-প্রতিক্রিয়া লিখে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলাম দেশের উল্লেখযোগ্য গল্পকার জাকির তালুকদারকে। অনেক ব্যস্ততার মধ্যে তিনি গল্পটি পড়ে এর ওপর পাঠ-প্রতিক্রিয়া লিখে গোলাঘরে ছাপার জন্য দিয়েছেন। তাঁর কাছে গোলাঘর-এর পক্ষ থেকে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। গল্পের সঙ্গে গল্পকারের নাম না-থাকায় মন্তব্যকারী গল্পকারের নাম উল্লেখ না-করে শুধু গল্পের ওপর ভিত্তি করে মন্তব্যটি করেছেন। এতে মন্তব্যটি গল্পকার-ব্যক্তির প্রভাবমুক্ত থেকেছে আশা করা যায়। এটি হয়তো সত্যিই কৌতূহল-উদ্দীপক ব্যাপার। গল্পটি কেমন হয়েছে এবং এর ওপর মন্তব্য/আলোচনা কেমন হয়েছে সেই রায় অবশ্য শেষ পর্যন্ত পাঠকের ওপর বর্তায়। –সম্পাদক দ্বয়]

গল্পটির সূত্রপাত ইশারা দিচ্ছিল, এটি একটি ভালো গল্প হয়ে উঠবে। নানারকম অপ্রচলিত শব্দের আনাগোনা, বাক্যের গঠনে শিথিলতা তৈরির দক্ষতা মনে করিয়ে দিচ্ছিল যে এটি কোনো সৌখিন লেখকের গল্প নয়। লেখকের রয়েছে গল্পের নানা প্রকরণের সাথে পরিচয়।

আখ্যান একটি রয়েছে এই গল্পে। ছেঁড়াখোঁড়া, বলা যেতে পারে ইচ্ছাকৃতভাবে বারবার ছিঁড়ে ফেলা একটা আখ্যান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাঠ করে দেখা যায়, আখ্যান ছিঁড়তে এই গল্পের লেখক যতটা পারদর্শী বা মনোযোগী, সেগুলোকে ঠিকভাবে জোড়া দিতে ততটা নয়। আখ্যানের অমসৃণতা গ্রহণযোগ্য, কখনো কখনো প্রশংসনীয়, কিন্তু বেপথ হওয়া দুর্বলতার পরিচয়। এই অনুশীলন বাকি থাকলে পরিপূর্ণ গল্পকার হয়ে ওঠা মুশকিল।

গল্পের মাঝপথে এসে লেখক খেই হারালেন। বোঝা যায় তিনি গল্পকে এবং পাঠককে কোথায় নিয়ে যেতে চান তা নিয়ে নিজেই সন্দিহান। এইরকম সময়ে শুরু হয় লাফিয়ে লাফিয়ে চলা কম্যুটার ট্রেনের মতো। অথবা আশ্রয় নেন অনুভূতির অনুবাদের। যে কোনো সার্থক শিল্পকর্ম শেষ পর্যন্ত পাঠকের সামনে উপস্থিত করে অসীমের অনুভূতি। কিংবা বলা যায় পাঠককে এনে দাঁড় করায় অসীমের দিগন্তরেখার সামনে। এই গল্পটি সেখানে নিতে পারেনি পাঠককে। কিংবা হয়তো নিতে চায়ওনি।

# ধার্মিক বুর্জোয়া এবং অধার্মিক সর্বহারা

পল লাফার্গ/অরিন ভাদুড়ী

বুর্জোয়াদের মুক্তচিন্তা রোমের বুকে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দুজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর নেতৃত্বে–বার্থেলো ও হেকেল। এই মুক্তচিন্তা ভ্যাটিকানের ক্যাথলীয়বাদের বিরুদ্ধে এবং এতদিন ধরে ক্যাথলীয়বাদের ঐতিহ্যের আড়ালে যে-সব যাজক সম্প্রদায় উক্ত ধর্মের তথাকথিত অপরিবর্তনীয় সূত্রগুলোর সাহায্যে বুর্জোয়া মানসিকতায় আধিপত্য কায়েম করে আসছিল তাদের বিরুদ্ধে এক প্রবল আঘাত হানতে পেরেছিল।

মুক্তচিন্তাবিদরা ক্যাথলীয়বাদকে অভিযুক্তের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু সমস্ত ধর্মের মূল যে-ভিত্তি অর্থাৎ ঈশ্বরবিশ্বাস, সেই বিশ্বাস থেকে কি নিজেদের মুক্ত করতে পেরেছিলেন তাঁরা? বুর্জোয়া শ্রেণিভুক্ত এইসব চিন্তাবিদদের পক্ষে এই চিন্তা করা কি সম্ভব ছিল যে তাঁরা সেই খ্রিস্টধর্মকে পরিত্যাগ করতে পারবেন, যার আঁচল ধরেই ক্যাথলীয়বাদ বেড়ে উঠতে পেরেছিল?

খ্রিস্টধর্মের গতিপ্রকৃতি লক্ষ করলে দেখতে পাওয়া যায় যে এই ধর্ম সহজেই সমাজের অন্যান্য রূপগুলোর সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পেরেছে। তবে প্রথমত ও প্রধানত এই ধর্ম গড়ে উঠেছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও মজুরি-শ্রমের শোষণের উপর। কাজেই যেভাবেই বলা বা দেখা হোক-না কেন, অতীতেও এই ধর্ম বুর্জোয়াদের ধর্ম ছিল, ভবিষ্যতেও তাই-ই থাকবে। প্রায় এক হাজার বছর ধরে বুর্জোয়ারা তাদের সবরকম আন্দোলনে এই ধর্মকে সর্বদাই নিজেদের সঙ্গী করে নিয়েছে, তা সে নিজেদের সংগঠিত করার জন্যই হোক অথবা নতুন কোনো ভূখণ্ডে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার জন্যই হোক। বারবারই তারা এই ধর্মকে সামনে রেখে নিজেদের জাগতিক স্বার্থ মিটিয়েছে এবং বারবার তাদের একই কথা বলতে শোনা গেছে যে খ্রিস্টধর্মকে তারা সংস্কার করতে চায় এবং ফিরিয়ে আনতে চায় সেই দিব্যপ্রভুর শুদ্ধ বাণীসমূহকে।

ফরাসি দেশ সম্ভবত একটি অ-খ্রিস্টীয় দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে, এইরকম কল্পনা করেই ১৭৮৯ সালের বুর্জোয়া বিপ্লবপন্থীরা মহোৎসাহে যাজক সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন শুরু করেছিল। তাঁদের মধ্যে যাঁরা অধিকতর যুক্তিনিষ্ঠ ছিলেন, তাঁদের মনে হয়েছিল ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসকে যতদিন-না দূর করা যাবে,

ততদিন কিছু করা সম্ভব নয়। তাই পুরনো আমলের শাসনতান্ত্রিক পদাধিকারীদের মতোই তাঁরা আদালত থেকে শমন জারি করে ঈশ্বরকে দূর করে দিয়ে তার পরিবর্তে যুক্তিদেবীর আবির্ভাব ঘোষণা করলেন। কিন্তু বিপ্লবের ভূত তাঁদের মাথা থেকে নেমে যাওয়া মাত্রই আর-একটা আদেশ জারি করে রোবস্‌পিয়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন চরম সত্তাকে, ঈশ্বর অভিধাটি তখনও পর্যন্ত সেকেলে হিসেবেই গণ্য হচ্ছিল। কয়েক মাস যেতে না-যেতেই গ্রাম্য সহকারী-যাজকরা বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে চার্চের দরজা মুক্ত করে দেওয়া মাত্রই ভক্ত ও বিশ্বাসীরা সেখানে ঈশ্বরপ্রেমের উৎসব শুরু করে দিল। এরপরেই নেপোলিয়ঁ বোনাপার্তে বুর্জোয়াদের তুষ্ট করতে কঁকরদাৎ (Concordat) চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন। আর তখনই বিজয়ী বুর্জোয়াদের রুচির উপযোগী এক খ্রিস্টধর্ম তার রোমান্টিক, ভাবপ্রবণ, চিত্রোপম, ফুলবাবুসুলভ চরিত্র নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল শাতোব্রিয়াঁর নেতৃত্বে।

মুক্তচিন্তার ধারায় যে-সব বুদ্ধিজীবীদের উদ্ভব হয়েছিল, তাঁরা প্রায় সকলেই এই মত দৃঢ়তার সঙ্গে পোষণ করেছেন এবং এখনও করছেন (যদিও সাক্ষ্যপ্রমাণ ব্যতিরেকে) যে বিজ্ঞানই বিশ্বসৃষ্টি রহস্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সাহায্যে মানুষের মস্তিষ্ক থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব মুছে দিতে পারে তাঁকে অবাস্তব প্রমাণিত করে। তবুও কয়েকজন বাদে বেশিরভাগ বিজ্ঞানী আজও সেই বিশ্বাসের মহিমায় মুগ্ধ। লাপ্লাসের ভাষায়, নিজের গবেষণার বিষয়বস্তুটিকে ব্যাখ্যা করার জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্বকে মেনে নেওয়ার আবশ্যকতা কোনও বিজ্ঞানীর যদি না-ও থাকে, তাহলেও তিনি তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র বাদে অন্যান্য ক্ষেত্রে ঈশ্বরকে অনর্থক বলে ঘোষণা করার সাহস যোগাড় করে উঠতে পারেন না। বরং প্রায় সব বিজ্ঞানীই সমাজের গতিপ্রকৃতির সুষ্ঠুতা ও জনগণের নৈতিক চরিত্রের বিকাশের ক্ষেত্রে ঈশ্বরকে মোটামুটিভাবে প্রয়োজনীয় বলেই মেনে নিয়েছেন। বিজ্ঞানীদের মস্তিষ্কে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে যে-ধারণা ছিল তা থেকেই গেছে, উপরন্তু এই বিচারহীন কুসংস্কার কেবলমাত্র গ্রাম্য সরল-সহজ মানুষকেই প্রভাবিত করে ক্ষান্ত থাকেনি, সভ্য জগতের শিক্ষিত বুর্জোয়াদের মধ্যেও প্রবলভাবে জায়গা করে নিতে পেরেছে। এর ফলে এই বুর্জোয়াদের কেউ-কেউ অশরীরীদের সমাবেশ ঘটিয়ে তাদের থেকে খবর বার করার চেষ্টা করে, কিংবা পাদুয়ার সেন্ট অ্যান্থনি চার্চের সামনে নিজেদের মনকে কল্পনার মহাশূন্যে ভাসিয়ে দিয়ে তাদের হারানো বস্তুর সন্ধান করে, লটারির জন্য কোনটা সৌভাগ্যসূচক নম্বর তা অনুমান করার চেষ্টা করে অথবা পলিটেকনিক পরীক্ষায় কীভাবে পাশ করা যায় তার রাস্তা খোঁজে। এদের মধ্যে কেউ-কেউ জ্যোতিষীদের কাছে নিয়মিত যাতায়াত করে থাকে অথবা অদৃষ্ট বস্তু দর্শনের আশায় কোনো অলৌকিক দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের কাছে আনাগোনা করে কিংবা কোনো কার্ড-রিডারের কাছে গিয়ে ভবিষ্যৎ জানতে চায়, আবার কেউ-কেউ তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা শোনার জন্য ছোটে। তাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান তাদেরকে চূড়ান্ত নির্বোধ বিশ্বাসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না।

বুর্জোয়াদের সব গোষ্ঠীগুলোতে ধর্ম তার সজীবতা বজায় রেখে হাজারো রকম ভাবে নিজেকে পল্লবিত করলেও শিল্পীয়-সর্বহারারা কিন্তু ধর্মের প্রতি এক ধরনের অযৌক্তিক অথচ অখণ্ডনীয় ঔদাসীন্য বজায় রেখেই চলে।

লন্ডনের ধর্মীয় অবস্থার গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ চার্লস বুথ তাঁর সহকারীদের লন্ডনের 'প্রতিটি জেলায়, প্রতিটি রাস্তায় ও প্রায় প্রতিটি বাড়িতে পাঠিয়ে' তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং বলেছেন, 'সেখানকার মানুষরা কোনোরকম ধর্মীয় পেশা গ্রহণ করতে যেমন পরাঙ্মুখ, তেমনি ধর্ম সম্পর্কে কোনোরকম উৎসাহও নেই তাদের...। লন্ডনের সাধারণ মানুষদের অধিকাংশই মজুরশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত যারা নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও 'গরিব' শ্রেণির মাঝামাঝি একটা জায়গায় অবস্থিত। এই মজুরশ্রেণি সাধারণের সবরকম ধর্মীয় সংগঠন থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে...। লন্ডনের চার্চগুলো সাধারণত অবস্থাসম্পন্ন লোকেদের এবং যারা তাদের থেকে ভালো অবস্থাসম্পন্ন মানুষদের কাছ থেকে দানধ্যান পৃষ্ঠপোষকতা আশা করে তাদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে...। সাধারণ শ্রমজীবী মানুষরা তাদের কর্তব্য ও সেই কর্তব্য সম্পাদনে নিজেদের ব্যর্থতার কথা চিন্তা না-করে তাদের পক্ষে কোনটা সঠিক ও কোনটা বেঠিক তা নিয়েই বেশি চিন্তা করে থাকে। পাপবোধ, হীনম্মন্যতা বা ভক্তির আবেগাপ্লুত আচরণ তাদের কাছে সম্ভবত খুব স্বাভাবিক বলে গণ্য হয় না।' উপরোক্ত অকাট্য তথ্য থেকে এই সত্যই প্রমাণিত হয় যে, লন্ডনের শ্রমজীবী মানুষদের অত্যন্ত ধার্মিক বলে মনে করা হলেও তারা তাদের সহজাত প্রবৃত্তির দিক থেকে ধর্মকে কোনোমতেই স্বীকার করে নেয় না। ফ্রান্সের শিল্পোন্নত শহরগুলোতেও শ্রমজীবী মানুষদের এই একই ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। তবে যদি কোনো শ্রমজীবী সেখানে ধর্মকে অনুসরণ করে কিংবা প্রকৃত ধার্মিক রূপে (যদিও তা খুব কদাচিৎ) আচরণ করে, তাহলে বুঝতে হবে ধর্মকে তারা ত্রাণমূলক সহায়তার আকারে গ্রহণ করেছে। অন্যরা যদি কট্টর মুক্তচিন্তাসম্পন্ন হয়, তাহলে বুঝতে হবে তার পরিবারে কোনো পুরোহিতের অনধিকার চর্চার ফলে অথবা তাদের কর্মচারীদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের উপর পুরোহিতের হস্তক্ষেপের ফলেই তা ঘটেছে।

সবরকম ধর্মীয় ব্যাপার সম্পর্কে ঔদাসীন্যই অধার্মিকতার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ এবং ল্যামেনিয়াসকে উদ্ধৃত করে বলা যেতে পারে– এই ঔদাসীন্য আধুনিক শ্রমজীবী মানুষরা জন্মগতভাবেই পেয়ে থাকে। বুর্জোয়াদের বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন ধর্মপন্থী বা ধর্মবিরোধী রূপ নিলেও ইউরোপ ও আমেরিকার বৃহৎ শিল্পকারখানার সর্বহারাদের মধ্যে কিন্তু কখনোই খ্রিস্টধর্মের পরিবর্তে কোনো নতুন ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার বা তাকে সংস্কার করার কোনো প্রবণতা লক্ষ করা যায়নি।

পৃথিবীর উভয় গোলার্ধেরই শ্রমজীবী মানুষদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলো সবরকম মতবাদধর্মী আলোচনা, ধর্মীয় মতবাদ এবং আধ্যাত্মিক ধারণা সম্পর্কে নিস্পৃহ থেকেছে, যদিও তাদের এই ধরনের মনোভাব তাদেরকে পুঁজিপতি

শ্রেণির পোষ্য সব ধরনের পুরোহিত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি।

বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় কমবেশি শিক্ষিত হতে পেরেও বুর্জোয়ারা ধর্মের ধারণার দ্বারা এখনো শিহরিত হয় কী করে, যেখানে কোনোরকম বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ছাড়াই শ্রমজীবী মানুষরা ধর্মের হাত থেকে মুক্ত করেছে নিজেদের?

ব ই / আ লো চ না

## কঠোর ব্যক্তিত্বে উত্তীর্ণ কবিতায়

.....

শ ও ক ত  হো সে ন

| | | |
|---|---|---|
| বই | : | হাঁটো, হাঁটাবাবা |
| কবি | : | শান্তনু চৌধুরী |
| প্রচ্ছদ | : | ওয়াকিলুর রহমান [ইমেজ অবলম্বনে] |
| প্রথম প্রকাশ | : | মাঘ, ১৪১৯। ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ |
| প্রকাশক | : | উলুখড় |
| পৃষ্ঠাসংখ্যা | : | ৬৪ |

যত রকম স্বাতন্ত্র্যের কথাই বলা হোক-না কেন– শান্তনু চৌধুরীর কবিতা শেষাবধি জীবনানন্দ দাশ সৃষ্ট ধারার যে প্রবহমানতা, তারই অনুগামী। ব্যক্তিজীবনের দৃশ্যগত স্থিতি ও সাধনার প্রমাণ রেখে যে দু-একজন কবি কবিতায় নিবেদিত, শান্তনু চৌধুরী তাঁদের একজন। সম্ভবত রাজনৈতিকভাবে সচেতনতা তাঁকে করেছে প্রতিষ্ঠান-বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং ভোগবাদী ধারার বিপরীতে জ্বলজ্বলে এক কবিতা-কর্মী। 'সম্ভবত' বললাম এ-কারণে যে, সাহিত্যিকের রাজনৈতিক মতাদর্শ বাহ্যত পরিস্ফুটিত নয়, শান্তনু সেদিক থেকে আরও একধাপ বেশি অন্তর্মুখী। অনুভূতির সবকিছু দেখার

প্রয়াস শিল্পের চশমায়। বাহুল্য জীবন, মার্জিত আদব কবিকে এনে দিয়েছে বিশেষ অহং। স্থূল সামাজিক আসন-অনাসনের টানাটানি, টিপ্পনি ও শ্লেষ প্রতিনিয়ত করে বিব্রত, লজ্জিত এবং বিতর্কিত। জীবন তো ধর্মগ্রন্থ নয়, যে, স্থির বিন্দু থেকে স্থির বিন্দুতে পৌঁছে যাবে সরল রেখায়! সুতরাং জীবনের তাগিদ ও প্রহসনে চণ্ডাল সমাজের জীব হিসেবে নিজের কাছেই নিজে বিক্ষত। আবার শিল্প তো শেষাবধি নিরাশ্রয় করে না কাউকে; শান্তনুরও শেষাশ্রয় কবিতা নামক শিল্প; এর প্রশ্রয়ে কোমল ডানার নিচে হয়তো একা বিদ্রোহী হন, ফুঁপিয়ে কাঁদেন, স্থির হয়ে ঘুমিয়ে পড়েন পরদিন অফিসে যাওয়ার তাড়নায়।

ব্যক্তিত্বের মতোই কবিতা তাঁর আপোষহীন। ব্যক্তিজীবন যেমন তোয়াক্কাহীন, কবিতাও একরোখা– সে কারণে কখনো-সখনো হয়তো ব্যঞ্জনায় নাতিকোমল। কাঁচা বয়সী উঠন্তস্তন-তরুণীর উদ্দাম ডুবসাঁতার নয়– হয়তো প্রাপ্তবয়স্ক বুদ্ধিদীপ্ত নারীর কপালের সচেতন টিপ– শান্তনুর কবিতা।

আশি-র কবিদের মধ্যে এখনো যারা সক্রিয়, তিনি তাঁদের একজন। কবিতার বিষয়– দ্বন্দ্ব, সংঘাত, টানাপোড়েন, সামষ্টিক সাধারণের রাগ-ক্ষোভ-প্রতিবাদ এবং ব্যক্তি-জীবনের স্বপ্ন, হতাশা ও যন্ত্রণা। যদি এভাবে বলি জীবনানন্দ যে-ভাষা শুরু করেছিলেন, তারই আরেকটি বর্ধমান শাখা শান্তনু, তাহলে বোধ হয় খুব ভুল হবে না। প্রায় বছরদশেক আগে শান্তনুর কবিতা নিয়ে কোনো-এক আলোচনা অনুষ্ঠানে একই কথা আমি বলেছিলাম। সেই অনুষ্ঠানে আমার বক্তব্যের অবশ্য তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন তারেক শাহরিয়ার। তারেক ভাই ছিলেন রাজনৈতিকভাবে সচেতন চলচ্চিত্রনির্মাতা, শান্তনু দা'র ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

দৃশ্যত স্থির জীবনের অন্তরালের চরম অস্থিরতা কবির বিষয়বস্তু ও ভাষায় একাকার হয়ে আছে। তাৎক্ষণিকতা থেকে অনেকটাই মুক্ত– অনেকটাই উৎরে গিয়ে চিরায়ত উপাদান বা চিন্তাকে কবিতায় পুরে দিতে পেরেছেন। তবে নিরীক্ষার ছোবলে কখনো যেন নীল হতে বসে। আবুল হাসান লিখেছিলেন, "এই যে মানুষ, মুখে একটা মনে একটা– খারাপ লাগে, খারাপ লাগে!" শান্তনু সেই পৃথিবীরই জীব হয়ে যেন-বা মুখে যা কাজে তা-ই হওয়ার প্রচেষ্ট সাধক! সুতরাং তাঁকে কবি হিসেবে তো বটেই, নিতান্ত মানুষ হিসেবেও ভিন্নমূল্য দিয়ে ভাববার দরকার রয়েছে বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে দাবি করি।

## দুই.

শান্তনু চৌধুরীর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে সম্ভবত সাতানব্বই'র মধ্যভাগে তৎকালীন পিজি হাসপাতালের ভেতরের খোলা চত্বরে গাঁজার আড্ডায়। সে-সময় আজিজ সুপার মার্কেটের মান্নান মামার হোটেল এলিতে আমরা বিকেল থেকে রাত দশটা অব্দি আড্ডা দিতাম; এলি-তে অনেকেই আড্ডা দিত, তবে আমাদের নির্ধারিত টেবিলে উপস্থিত

থাকত সমরেশ দেবনাথ, জ্যোতি পোদ্দার, রথো রাফি, মজনু শাহ্, নাভেদ আফ্রিদি, তারেক মাহমুদ, জীবন নজরুল, বাদল ভাই, রওশন ঝুনু, আয়শা ঝর্ণা, শামীম সিদ্দিকী, শৈবাল আদিত্য, মারজুক রাসেল প্রমুখ। এছাড়া এলিতে আরও উপস্থিত থাকত টোকন ঠাকুর, সরকার মাসুদ, পথিক নবী, অলকা নন্দিতা, জাফর আহমদ রাশেদ, অদিতি ফাল্গুনী, মুজিব মেহদী, ডেভিড সজ্জন বিপ্লব, রেজাউদ্দিন স্টালিন, মাঝেমধ্যে চঞ্চল আশরাফ, শামীমুল হক শামীমসহ আরও অনেকেই– এছাড়া অনেকের নাম এখন মনে নেই। তবে জ্যোতি, রথো, সমরেশ, জীবন, মজনু, তারেক, শৈবাল, মারজুক– এ-ক'জনের সঙ্গেই আমার আড্ডা হত বেশি। আজিজের আড্ডা দশটা নাগাদ শেষ হলে কেউ-কেউ বাসায় চলে যেত। অবশিষ্টরা শাহবাগের মোড়ে পিজির গেটে আমতলায় চায়ের দোকানকে ঘিরে জুড়ে দিতাম আড্ডার দ্বিতীয় পর্ব।

পিজির গেট থেকে কয়েক কদম ভেতরে বিশাল বটগাছ; এই বটের গোড়ায়ও চলত হরদম আড্ডা; এর থেকে একটু ভেতরে ঢুকলে তিন জনের, চার জনের একেকটা গ্রুপ; গোল হয়ে পাক খেতে-খেতে উঠে যায় গাঁজার ধোঁয়া। গাঁজার সেই আড্ডায় সরকার মাসুদ, রিফাত চৌধুরী, রতন মাহমুদ, জুয়েল মাজহার অগ্রগণ্য। আমি গাঁজার ধোয়া বেশি নিলেই আমার প্রেসার হাই হয়ে যেত; আবার গোল হয়ে বসায় সবার হাত ঘুরে আমার হাতে ক্ষয়িষ্ণু স্টিকটা এলে না-করতে পারতাম না।

সম্ভবত সাতানব্বইয়ের কোনো এক মাসে এ রকম কোনো এক আড্ডায় শান্তনু দা'র সাথে আমার প্রথম পরিচয়। প্রতিদিন না-এলেও মাঝে-মধ্যেই শান্তনু দা চলে আসতেন ধোঁয়ার টানে। যেখানে শান্তনু চৌধুরী সেখানে তপন বড়ুয়া তো থাকবেনই; তপন দা সম্পাদিত 'গাণ্ডীব' তখনো শান্তনু দা-র লেখা ছাপার প্রধান জায়গা। পরিচয়ের পর-পরই তাঁর কবিতা পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করায় যতদূর মনে পড়ে, শান্তনু দা তাঁর কবিতার প্রথম বই 'উৎস থেকে বহ্নি থেকে' আমাকে গিফ্‌ট করেছিলেন আজিজের কোনো একটি গোডাউন বা দোকান থেকে নিয়ে। তাঁর কবিতা-প্রকাশের জায়গা, লিটলম্যাগ-দর্শন ইত্যাদি বুঝতে পারার পর অনেকের মতো আমার সঙ্গেও শান্তনু দা'র দূরত্ব তৈরি হতে পারত। কিন্তু তা হয়নি। আমি ভালো ও স্বতন্ত্র লেখায় আস্থাশীল– কোথায় সেটি ছাপা হল সেটি আমার প্রধান বিবেচ্য ছিল না (সাম্প্রদায়িক ও যুদ্ধাপরাধীদের পত্রিকা বাদে), যে-দর্শন বাস্তবতার নিরিখে আমি এখনো লালন করি। কিন্তু শান্তনু চৌধুরী নির্দিষ্ট দু-তিনটি পছন্দের লিটলম্যাগাজিনের বাইরে লিখতেন না, যা এখনো তিনি ধরে রেখেছেন। শান্তনু দা আশির অথচ আমি নব্বই'র কবিতা-কর্মী হওয়া সত্ত্বেও শান্তনু চৌধুরীর সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল ভালো যা এতদিনেও নষ্ট হয়নি। তাঁর প্রতি আমার দুর্বলতার প্রধান কারণ ব্যাখ্যা করতে গেলে বলতে হয়, অধিকাংশ সময়ে তাঁর সৃষ্টিকর্মের মহিমাকেও তাঁর চমৎকার ব্যক্তিত্বের মহিমা ছাপিয়ে যেত বা যায়। এমন ব্যক্তিত্বের মানুষ আমার দেখা কবিদের মধ্যে দ্বিতীয় জন দেখিনি। হয়তো কবিতার প্রতি আমার একনিষ্ঠতা শান্তনু দার মধ্যেও

আমার প্রতি ইতিবাচক ধারণা তৈরিতে সহায়তা করেছিল। সে-কারণে আমার একাধিক ঘনিষ্ঠ বন্ধু যেমন মজনু শাহ, রথো রাফি– শান্তনু চৌধুরী, তপন বড়ুয়া প্রমুখ'র সঙ্গে লিটলম্যাগ প্রশ্নে অযুক্ত অবস্থা থেকে যুক্ত হয়ে আবার এরা বিযুক্ত হয়েছে; কিন্তু লিটলম্যাগের দর্শন প্রশ্নে শান্তনু দা'র সঙ্গে আমার অবস্থান আগের মতো পৃথক পালঙ্কে আছে বিধায় মজনু বা রথোর মতো ব্যক্তিগত সম্পর্ক তাঁর সঙ্গে নেতিবাচক না-হয়ে আগের মতোই রয়েছে। উল্লেখ্য, একবার আমি জীবিকাশূন্য হয়ে পড়লে শান্তনু দা তাঁর কর্মস্থলেই আমার জীবিকার ব্যবস্থা করেছিলেন; তখন উনি ইউএনবি'র বাংলা বিভাগের প্রধান সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর সহযোগিতায় তাঁরই বিভাগে পাওয়া ওই চাকরি অবশ্য সপ্তাখানেকের বেশি করা হয়নি।

পৃথিবীতে রাজনৈতিক ধারা বহুরকমের নেই; সামন্তযুগের পর পুঁজিবাদের যুগে এমনকি এর চরম বিকাশের কালে বহুবার শান্তনু দা-র রাজনৈতিক দর্শন সম্পর্কে জানতে চেয়েছি। শিল্পীর রাজনৈতিক দর্শন যেমন রাজনীতিকের মতো চাক্ষুষ নয়, আবার রাজনৈতিক দর্শন ব্যতীত শিল্পের উচ্চতর চর্চা সম্ভব নয়। আবুল হাসান যখন বলেন, "দালান গড়ছে ইহা রাজনীতি
দালান ভাঙছে ইহাও রাজনীতি"

কিংবা

"মৃত্যু আমাকে নেবে জাতিসংঘ নেবে না"

তখন হাসানের দর্শন বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না। হয়তো সে-কারণেই শান্তনু চৌধুরী মুখে সেই দর্শন আউড়াতে যত-না আগ্রহী, তারচেয়ে তাঁর রচনা থেকে পাঠক দর্শনকে আবিষ্কার করে নিক– এমনটি ভাবতেই স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন। তাঁর রচনা পাঠের মধ্যদিয়ে আমি বুঝতে সক্ষম হয়েছি, আমার ও শান্তনু দা'র রাজনৈতিক দর্শনের মত ও পথ এক ও অভিন্ন– সমাজবাদী ধারায়– তাঁর সাথে আমার সখ্যতার সম্ভবত এটিও একটি কারণ।

## তিন.

শান্তনু চৌধুরীর কবিতার তৃতীয় গ্রন্থ "হাঁটো, হাঁটাবাবা"-য় প্রবেশের পথে চোখে পড়ে উৎসর্গপত্রটি–

"ইশতেহার-পর্বের দুই কবি
সাজ্জাদ শরিফ ও শোয়েব শাদাব
বন্ধুবরেষু"

লক্ষণীয়, সাজ্জাদ শরিফ আদর্শগতভাবে শান্তনু চৌধুরীর একেবারেই বিপরীত মেরুর; সাজ্জাদ চলমান সময়ে সাহিত্য-কর্ম প্রকাশের মিডিয়া বলতে যা বোঝায় সেই মিডিয়ার

প্রায় 'গড ফাদার'-এর ভূমিকায় নিজেকে উপস্থাপন করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। চলমান সময়ে উল্লেখ করার মতো কোনো নিবেদন সাহিত্যে তাঁর নেই বললেই চলে। অতীতের এক সময়ে হয়তো হাতেগোনা কয়েকটি উত্তীর্ণ কবিতা লিখেছিলেন; বর্তমানে নিতান্ত উপরি-কাঠামো ভিত্তিক একধরনের নিবন্ধ লিখে থাকেন; এগুলোকে মৌলসাহিত্যের সংযোজন বলা যায় না। কিন্তু সাংগঠনিক তৎপরতার দিক থেকে একজন শান্তনু যা ধারণ করেন সাজ্জাদ তার ঠিক উল্টো। শান্তনুর সাথে তাই সাজ্জাদ শরিফের যে-সম্পর্ক তা একেবারেই ব্যক্তিক, আদর্শিক নয়। তবে আদর্শিক সম্পর্ককে যখন ছাপিয়ে গিয়ে ব্যক্তিক সম্পর্ক অধিক মাত্রা পেতে থাকে তখন সাজ্জাদ ইমেজগতভাবে লাভবান হলেও শান্তনু চৌধুরীর তিল-তিল করে গড়ে ওঠা ইমেজ প্রশ্নের মুখে পড়ে। তরুণ কবিদের মধ্যে কয়েকজনকে বলতে শোনা গেছে, প্রতিষ্ঠান-বিরোধী কবি শান্তনু চৌধুরী প্রতিষ্ঠানের একনিষ্ঠ খাদেম সাজ্জাদ শরিফকে কবিতার বই উৎসর্গ করেই ক্ষান্ত হননি বরং কবিতার বইয়ের আলোচনা অনুষ্ঠানেও একই মঞ্চে তাদের সহাবস্থান তরুণ কবিদের কষ্ট দিয়েছে– তবে কি তাঁরা আগারও খান, গোড়ারও টোকান? আমার মতামত হল, ব্যক্তিগত সম্পর্ক বিয়ে-উৎসব, জন্ম-উৎসব, মৃত্যু, খাতনা– এসব ক্ষেত্রে মানায়। কিন্তু এতকাল পরে শান্তনু যখন আদর্শিক অর্থাৎ সাহিত্যের চশমায় তাকিয়ে সাজ্জাদকে সম্মান দিতে চান, তখন এর নেপথ্যের কার্যকারণ কোনো উৎসুক পাঠক যদি ঘাঁটাঘাঁটি করতে যান, তবে বুঝতে হবে, শান্তনুর আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থার কারণেই সেই পাঠক এহেন কর্ম করতে পারেন।

## চার.

দেখা যাক শান্তনু চৌধুরীর কবিতার প্রথম বই 'উৎস থেকে বহ্নি থেকে', কবিতার দ্বিতীয় বই 'উনুনসূত্র'-র পরে তৃতীয় বই 'হাঁটো, হাঁটাবাবা'য় কী আছে?

বইটিতে আছে ১২টি বড় কবিতা; এগুলোকে দীর্ঘ কবিতা বলা যাচ্ছে না আবার বাংলা কবিতার সাইজ বিবর্তিত হতে-হতে ১৪ থেকে ২০ লাইনের যে দৈর্ঘ্যের বৈশিষ্ট্যে এসে দাঁড়িয়েছে, সেই বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও পড়ে না; ফলে এ বইয়ের প্রথম ১২টি কবিতাকে 'বড় কবিতা' নামে ডাকতেই আমি রাজি। এই ১২টি-র বাইরে বইয়ের শেষাংশে রয়েছে প্রচল সাইজের আরও ৭টি কবিতা।

এবার কবিতাগুলোর অন্তর্গত বৈশিষ্ট্য ও মান নিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করা যাক–

প্রথম কবিতার নাম, 'হাঁটাবাবা'।

উদ্ধৃতি–

"হাঁটাবাবা, এখনও অর্ধেক শাদা পৃষ্ঠা,

.....

.....

ওরা শামুকের দল, ওরা শাদা বুদবুদ, ওরা সবকিছু ছেড়ে-ছেড়ে
যাবার সময় ফের সবকিছু সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়, অথচ ভেতর
থেকে মরে গেছে ওরা,

.....

.....

তবু লালবই ভয় পায় ওরা, তবু আড্ডা দিয়ে বুনোমোষ
সকলে তাড়ায়, হাঁটাবাবা, সকলে এখনও বানরের পিঠা
ভাগ করে কিংবা আগে থেকে ওরা জেনে যায় ভেতরের হাসি,
অথবা সালিশ মানে কিন্তু তালগাছ আজও ভাবে নিজেদের,

.....

.....

এভাবে চালিয়ে যেতে হয়, এই হাই সাইকেল, হাঁটাবাবা,
আসলে এটাই মুশকিল, কোথাও চালিয়ে যেতে হয়, কাউকে ছাড়াই"

কবিতাটির ভাষা দুর্বোধ্য বা অবোধ্য নয়। আবার আপাত সহজবোধ্যতার ভেতরে চিন্তার যে গতি, প্রত্যাবর্তন ও বাঁক রয়েছে, সেগুলোকে বুঝতে ভুল করলে কবিতাটিকে নিতান্ত ভ্রমণ ছাড়া কিছু মনে হবে না। রাজনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে কবিতা ভিত্তিভূমি নির্মাণ করতে চাইলেই পরজীবী গবেষক-অধ্যাপক-সমালোচকগণ নানা কূটচালে উচ্চস্বর-স্লোগান ইত্যাদি বলে সেই ভিত্তিভূমিকে পানিতে ডুবিয়ে দিতে উদ্যত থাকেন। কিন্তু আলোচ্য কবিতার কবি এমনই এক কৌশল নিয়েছেন যে, প্রচলিত অভিধা বা গালিগুলো এক্ষেত্রে যেন আর ক্রিয়া করছে না– অথচ চরমভাবে রাজনৈতিক, পক্ষ-বিপক্ষ নির্ধারণী এই কবিতায় গণমানুষের খোরাক না-থাকলেও গণ-মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষারই সারাৎসার ও স্বপ্ন বুননের পাঁয়তারা বই কিছু-না এই কবিতা। বলা যায়, 'হাঁটাবাবা'য় শান্তনু চৌধুরী সারা জীবনের লালিত দর্শন যেন একটি ক্যাপসুলে পুরে দিয়েছেন।

দ্বিতীয় কবিতা 'গুহাগুহানুভূতির জীব' খুব সহজভাবে শুরু হলেও এখানে জীবনের চরম সংকট, ব্যক্তি ও সমষ্টির বিপর্যয় উঠে এসেছে। বাংলাদেশের কবিতায় মুক্তিযুদ্ধ ও ভাষা-আন্দোলন– এ দুটি ঐতিহাসিকতার বাইরে রাজনৈতিক দৃষ্টিতে শ্রেণিদ্বন্দ্বের জায়গা থেকে সামষ্টিক স্বর নির্মাণ খুব একটা চোখে পড়ে না। সেখানে শান্তনু বলেন–

"তবু দেশলাই পেয়ে গেলে দ্বিধাহীন জ্বলে উঠি, বাঘ, সমস্ত খাঁচার,"

এখানে 'সমস্ত খাঁচার' কথাটি দিয়ে সামষ্টিক এই পরাধীন জনগোষ্ঠীকে বোঝানো হয়েছে; বাঙালি যেমন বাঘ আবার উপনিবেশ-অতিক্রান্ত সময়ে এই নয়া-উপনিবেশের কারণে পরাধীনতাকেই কবি পরিণতি হিসেবে গ্রাহ্যসীমার মধ্যে এনে, খাঁচা ভাঙার জন্য দ্বিধাহীনতার শর্ত পাঠকের মধ্যে জারি করে দিতে সচেষ্ট হয়েছেন।

কবিতা কিছু আড়ালও দাবি করে। শুধু কবিতাই নয়, যেকোনো শিল্পে সৌন্দর্য নির্মাণের ক্ষেত্রে অনিবার্যভাবে আড়ালকে মান্য করতে হয়।

"তবু সকলেই না-চেনার ভান করে, সবাই পুরনো পলিটিক্স করে,"

আলোচ্য কবিতাটির বক্তব্য স্বচ্ছ করার প্রয়োজনেই কবি হয়তো এমন মূর্ত করে উপস্থাপন করেছেন; কিন্তু কবির ভাবা দরকার ছিল, তাঁর কবিতার যারা পাঠক তাঁরা পাঠ-প্রক্রিয়ার একটি বিশেষ পর্যায় অতিক্রান্ত। কাজেই এ-ধরনের সহজতা এমন একটি উৎকৃষ্ট কবিতার কাল হতে পারে; কবি এদিকটি বুঝে উঠেও আবার নিজেকে হয়তো ধরে রাখতে পারেননি। কেননা, শান্তনু চৌধুরীর কবিতা যে বিনা বিচার-বিবেচনায় বইয়ের রূপ নেয়নি, সে-কথা তাঁর পাঠকমাত্রই বুঝতে পারেন। তাছাড়া দীর্ঘ ও বড় কবিতার ঝুঁকিও এখানেই। শুধু শান্তনু চৌধুরী কেন, 'মেঘনাদবধ' মহাকাব্যেও এমন পতন চোখ এড়াবার নয়। সুতরাং যারাই বড় বা দীর্ঘ বা মহা কবিতা রচনা করি-না কেন, সবার কাছেই এই লিকিউডিটি বা তারল্য বা সরলতা এড়ানোর আহ্বান রইল। এই আহ্বান যেন আমার নিজের কাছে নিজেরও।

'সদাই শুভঙ্করের ফাঁকি', 'যদ্যপি ধাঁধার পর ধাঁধা', 'বিভ্রমের ফুল লাল', 'যেখানে বাঘের ভয়', 'ল্যাবেন্ডিশের দৌড়', 'বিন্দুবিসর্গের খোঁজে', 'ছেলের হাতের মোয়া', 'ছিদ্রপথে দেখা', 'শতভাগ ভুল' ও 'যেমন খুশি তেমন হাঁটো'– এ-বইয়ে এরূপ ক্রম মেনে কবিতাগুলো সাজানো আছে। উল্লিখিত কবিতাগুলোর উপস্থাপন প্রধানত বর্ণনামূলক। খুলে বলার প্রবণতা। তবু, কিংবা, তবে, যদি, যেন, অথচ, তথাপি ইত্যাদি ধরনের শব্দের বিদায় ঘোষণা করে ক্রিয়াপদকে বিশেষ্যে, বিশেষ্যকে ক্রিয়ায় ব্যবহারের অভিনব পন্থা দেখিয়েছিলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। শান্তনু চৌধুরীর পরবর্তী দশকগুলোর কবিদের মধ্যেও ভাষাকে সংক্ষেপনের উদ্দেশ্যে যে-প্রতীক ব্যবহারের ঝোঁক লক্ষণীয়, শান্তনু চৌধুরী সেই নিরীক্ষায় আমল দেননি। বরং বোধকে ভেঙেছেন, বাঁক থেকে বাঁকে-বহুবাঁকে নোঙর গেড়েছেন, নোঙর তুলে খরস্রোতে ভেসেছেন, ভাঙনের দিনে নির্মম হয়ে গতিপথ বার-বার পরিবর্তন করেছেন– এবং এ-সবই দক্ষ হাতে করেছেন প্রতিষ্ঠিত এক পরিচিত ভাষায়। যাকে কোনোভাবেই বলা যায় না অপরিচিত, নতুন বা অভিনব। জীবনানন্দ দাশ বক্তব্যকে যেমন বহুরৈখিক দ্বিধা আর দ্বন্দ্বের মধ্যে ফেলতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন, শান্তনু সেখানে একরৈখিক ও সিদ্ধান্তদাতা। এক্ষেত্রে বিনয় মজুমদারের সিদ্ধান্তমূলক রচনার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে শান্তনুর উপস্থাপন-ধরনটা খানিকটা মিলে যায়– কিন্তু বিনয়ের সারা জীবনের কাব্য-চিন্তা ও বোধের কেন্দ্র একটি; শান্তনুর সেখানে কাব্য-চিন্তা ও বোধের কেন্দ্র একাধিক ও বহু। শান্তনু চৌধুরীর কবিতার শুরু ও শেষ নেই; চলমান স্রোত বা বহমান সময়ের মতো। একটি উদ্ভিদের জন্ম, পক্কতা লাভ, ফলদান ও মৃত্যুর মতো আংকিক নয়– চিন্তার রেখাগুলো বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন। নারীপ্রেম, দেশপ্রেম, গণপ্রেম, বিশ্বপ্রেম– কোনো একক

প্রেমেই শান্তনুর মনোজগৎ স্থিত নয়; সবকিছুর মধ্যেই সবকিছুকে পুরে দিয়ে 'নির্মাণ' করেন, 'তৈরি' করেন– যা প্রকৃতি থেকে পাওয়া নয়, গডগিফ্‌টেড চিরায়ত বাল্মীকীয় বা কোরানীয় বাণী নয়; তিল-তিল করে জোড়া দিতে-দিতে, বুনন করতে-করতে গড়ে ওঠা শান্তনু চৌধুরীর কবিতা। বলে রাখা ভাল যে, জীবনানন্দ দাশও তো কবিতা হাওয়া থেকে ধরেননি; তাঁর অনেক সফল কবিতাও পরিকল্পিত।

## পাঁচ.

আগেই বলেছি, এ-বইয়ের শেষাংশের ৭টি কবিতা সাধারণ বা গড় দৈর্ঘ্যের। কম-রাহস্যিক চিত্রকল্পের কম-ব্যবহারে কমরসে রুগ্‌ণপ্রায় এগুলোও। তবে মৃত্যুযাত্রী নয়; হঠাৎ-হঠাৎ কবিতা যেন উঁকি দেয়–

" ..... কেন রক্তচিহ্ন ঘষে ঘষে তুলে
ফেলতে পারিনা দেয়ালের, নদীমাতৃক পাঠকসমাজের"
*(অনুচিন্তার ঘোর)*

" ..... নিঃসঙ্গক্রমে আসলে ভেতর থেকে মরে গেছি যারা,
আমরা বংশানুক্রমে যারা নতজানু .....
..... আমরা অস্পষ্ট যারা
শাদামাটা কাগজের বাঘ, শাদা হয়ে পড়ে থাকি,
শুধু শাদাসর্বস্ব ব্লিচিং পাউডার, ভোরের চেয়েও শাদা,"
*(সেলাইতামাশা)*

"কারা ছিল ডানপিটে? জলমাকড়সা? কিংবা কিলবিল পোকা
ছিল কারা? কাদের ঔরসে কবে জন্মেছিলে গেরস্থের খোকা?
অথচ মা ছিল আদিবাসী, বাবা ভোরের দোয়েল,
মমতার পালক হারিয়ে কেন কেঁদেছিলে পথে!"
*(শিশুভাষ্য)*

উদ্ধৃতিগুলো প্রমাণ দেয় কবিতার, জনাব শান্তনু আসলেই কবি। কিন্তু জীবনানন্দ দাশ যেখানে ইউরোপের কবিতার আদলে ভাব ও বিষয়কে উপস্থাপন করে চলেন দেশীয় সব চিত্রকল্পের পর চিত্রকল্প সাজিয়ে– শান্তনু সেখানে দেশীয় ও চিরায়ত ভাব ও বিষয়কে যেন হাজির করেন কথাপ্রধান বচন দিয়ে–

"বর্ণ কই! সে তো ছিল একটু আগেও, গেল কই!
অনেক অনেক দূরে কোথাও মিলিয়ে গেছে, বর্ণ!"
*(বর্ণচোরা)*

আলোচ্য উদ্ধৃতিগুলো বর্ণ নিয়ে; কিন্তু মনে হয় যেন বর্ণহীন; এ-কথাকেই ছবি, দৃশ্য বা চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা গেলে– সেটা শুধু কানেই শোনা যেত না, চোখেও দেখা যেত ।

শান্তনু চৌধুরীর পুরো বইটি সম্পর্কেই এ-কথা খাটে; যেখানে ছবি-চিত্র-দৃশ্যের ঘাটতি রয়েছে; একই বক্তব্যকে আরও সংক্ষিপ্ত পরিসরে পুরে দেয়ার জন্য প্রতীকায়নের ঘাটতি এ-সময়ে দাঁড়িয়ে চোখে পড়ার মতো; কবিতাগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য বর্ণনাধর্মিতা; অত্যন্ত দক্ষহাতে চিন্তার ভাঙচুর, ভাবের বাঁকবদল ও মহৎ-অমহতের সংঘাতকে কবি ক্রমাগত তুলে ধরেন প্রচল-প্রতিষ্ঠিত ভাষায় ।